শাকম্ভরীর দ্বীপ

আশাপূর্ণা দেবী

সেরা
প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড
৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৯

"সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড" ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ এর পক্ষে থেকে শ্রীশিশির ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন এবং এম, এম, ট্রেডার্স, ৩/২, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬ থেকে শ্রী অশোক মিত্র ছেপেছেন। প্রচ্ছদ শিল্পী : সুরজিৎ অধিকারী।

উৎসর্গ

শ্রী অশোক, সুরানা, মণীশ ও সুব্রতকে

— বাণী বসু

জমকালো হোটেল বিল্ডিংটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো সুমনা। কতবার এখান দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে। সেভাবে লক্ষ্য করে নি। পার্ক স্ট্রিট মানেই ভালো ভালো হোটেল, রেস্তোরাঁ। উল্টোদিকের ফুটপাত থেকে এখন দেখছে, কেননা এটাই তার নতুন কর্মক্ষেত্র। সাধারণ একটা অ্যাড ফার্ম থেকে এই যে লিফ্‌টটা ও পেলো, এটা ভাগ্য বলতে হবে। এই চাকরিটার দৌলতে এখন থেকে সে মিসেস রডরিগস-এর গেস্ট হাউজে একটা পুরো স্যুইট নিয়ে থাকতে পারবে। শোবার ঘর, বসবার লাউঞ্জ, সেখানেই কিচেন আর টয়লেট। ইচ্ছে করলে এখনও মিসেস রডরিগ্‌স্‌-এর কাছে খাওয়ার বন্দোবস্তটা রাখতেই পারে। ইচ্ছে করবে কিনা সেটা একটু ভাবতে হবে। কদিন না গেলে বলা যাচ্ছে না। শিফ্‌ট ডিউটি করে তো অভ্যেস নেই! যে শিফ্‌টে কাজ করবে সেই শিফ্‌টের সময়ে লাঞ্চ বা ডিনার হোটেলেই পাবে। ব্যবস্থাটা তার পক্ষে সুবিধের। খানিকটা টাকা জমিয়ে নিয়ে হোটেল ম্যানেজমেন্টের একটা কোর্স করে নেবার খুব ইচ্ছে আছে।

নেভি-ব্লু লং স্কার্ট আর একটা চমৎকার লাল রঙের কোট এই হল তার ড্রেস। নেভি ব্লু রংটার সঙ্গে স্কুলের দিনগুলো মিশে আছে। স্কুলের দিন, কনভেন্টের দিন। হঠাৎই যেন নিজেকে আঠারো বছর আঠারো বছর লাগে। মনে হয় এক্ষুনি গিয়ে কোর্টে দাঁড়াতে হবে, হাতে টেনিস র‍্যাকেট। স্পোর্টস-এর দিনগুলো ফিরে এলো যেন। বাজ্‌জ্‌জ্‌ করে একাট গুঞ্জনধ্বনির মতো উঠছে। বোলতার চাকে খোঁচা দিয়েছে যেন কেউ। গ্যালারির একদিকে মাদার সুপিরিয়র, সিস্টার জেন, সিস্টার অর্পিতা, সব বসে, আরও টিচাররা, তিনদিক জুড়ে স্কুলের প্রেপ থেকে টুয়েলভ্‌ পর্যন্ত মেয়ের দল। কোর্টের একদিকে সে র‍্যাকেট হাতে দুলছে, অন্যদিকে শিকারীর চোখে তার হাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে স্যারা, মিসেস ডিবেচোর মেয়ে। দারুণ খেলতো।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে এই সময়ে ফিরে আসে সুমনা। কেন যে কনভেন্টের অতীত কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছে না! কেন যে তার সিস্টার সুচরিতা, সিস্টার জেন আর মাদার সুপিরিয়রকে সব সময়ে মনে পড়ে! কেন যে সে এখনও ওই সময়টার ওপর নির্ভর করে আছে! সে তো ছোট থেকেই জানতো সে একলা। মোটামুটি একটা শিক্ষার পর তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং বাদবাকি জীবন নিজের মগজ দুটো হাত দুটো পা-র ওপর ভরসা করেই একা-একা পথ চলতে হবে।

রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকে যায় সে। গেটম্যান দরজা খুলে দেয়। ভেতরে শীতল আরাম। কয়েকটা ধাপ উঠে সে পৌঁছে যায় রিসেপশন কাউন্টারে।

গুড মর্নিং। এই মেয়েটির নাম বোধহয় মল্লিকা, রায় না কর কিছু একটা। সুন্দর হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

— মর্নিং। তোমাকে প্রথমে অফিসে যেতে হবে— কাউন্টারের একটা দিক খুলে ধরলো মল্লিকা।

স্বভাবতই। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সরিৎ বিশ্বাসের কাছেই তাকে রিপোর্ট করতে হবে। উনিই স্টাফ-ম্যানেজমেন্টে আছেন। ইন্টারভিউয়েও ছিলেন। বেশি কথা বলেন নি। যখন সে বললো, কনভেন্টে মানুষ, বাবা-মা কেউই নেই তখন তার দিকে কীরকম করে যেন তাকিয়েছিলেন দু পলক। দৃষ্টিটার মানে সে এখনও বুঝতে পারেনি।

ঘণ্টা বাজছে দূরে— তার জন্য বিশেষ প্রেয়ার। যখন সমবেত সিস্টারদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো— সিস্টার সুচরিতা ওকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাইকারই চোখ ছলছল করছে। মাদার বললেন— একটা সীমানা ছাড়িয়ে তুমি আরও বড় একটা জায়গায় যাচ্ছো সুমনা, আটকে থাকবার কোনও মানে নেই। এখন তোমাকে আরও প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। প্রস্তুত থেকো। অপ্রত্যাশিত আঘাত, সংকট, আবার অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিও হতে পারে। প্রস্তুতিই বাস্তবের মোকাবিলা করবার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। তুমি মনে রাখবে তোমার মা মৃত্যুর আগে তোমাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তোমাকে আমরা স্নেহমমতা দিয়ে মানুষ করেছি। এই স্নেহমমতা বা নিরাপত্তা তুমি বাইরের জীবনে পাবে না। নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

সিস্টার জেন তখন খুব হাসছিলেন— ভয় পাবে সুমনা? ওর গাছে চড়া আর পাঁচিলে হাঁটা মনে আছে?

মাদার কিন্তু একইরকম সিরিয়াস। বললেন— যা-ই করুক সে তো আমাদের এই চৌহদ্দির মধ্যে জেন! পৃথিবী বড় কঠিন ঠাঁই। চট করে কাউকে বিশ্বাসও করবে না, অবিশ্বাসও করবে না, সতর্ক থাকবে, আর মনটাকে নিজের আয়ত্তে রাখবে। তাহলে আর কোনও বিপদ তোমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এটাই এক মাত্র রক্ষা কবচ, মনে রেখো সুমনা।

— মাদার। আমি কি আর আপনাদের কেউ নই? কেউ থাকবো না?— সে থাকতে না পেরে বলেছিল।

তখন মাদার তাকে কোলে টেনে নিয়েছিলেন।— ভুল বুঝো না সুমনা। বিপদে আপদে সব সময়ে আমাদের পাশে পাবে।

আসবার সময়ে কিন্তু তার ভয়-টয় করেনি। সত্যি বলতে কি খুব একটা রোমাঞ্চ হচ্ছিল। রিপন স্ট্রিটে গেস্ট হাউসটা ওঁরাই দেখেশুনে ঠিক করে দিয়েছিলেন। প্রতি রবিবার সে কনভেন্টে যেতো। এখন কাজ বেড়েছে। বন্ধু বেড়েছে। এখন অতটা পারে না। এখানে যেমন। একটা অফ ডে আছে। কিন্তু রবিবার-টার নেই।

মা-বাবা নেই। না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু কোনও আত্মীয়স্বজনও নেই ? কাকা? পিসি? মামা? এসব প্রশ্নগুলো অবশ্য অনেক বড় হয়ে তার মনে উঠেছে।

কেন না সম্পর্কগুলোর কথা তো সে জানতোই না। ক্লাসে বন্ধুদের কাছে শুনে শুনে মনে হতে থাকে। তখন সে সিস্টারদের জেরা করতে শুরু করে। 'তোমার মা ছিলেন সদ্য বিধবা, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে এসে আমাদের হসপিটালে ভর্তি হলেন, তোমার সেই দাদু ঠাকুমা সারাক্ষণ কান্নাকাটি করছিলেন ছেলে মারা গেছে বলে, তোমার মাকে "অপয়া" বলছিলেন। তোমার জন্ম দিয়ে কদিন পরে যখন উনি মারা গেলেন, আর ওঁরা এ মুখো হলেন না। মেয়ে হয়েছে শুনেই কী রাগারাগি। ওঁরা অন্য কোথাও টাউনে থাকতেন, শেয়ালদার ঠিকানা দিয়েছিলেন। সেটা একটা হোটেল। আমরা ওঁদের ট্রেস করতে পারিনি। খুব সম্ভব ছেলে হলে নিয়ে যেতেন।' খুবই হতাশাজনক খবর।

— কেন সিস্টার?

— আরে এ দেশে মেয়ে লোকে চায় না। বিয়ে দিতে হবে, ডাউরি দিতে হবে। বংশরক্ষা করবে না। এইসব নানান কুসংস্কার...

যে দেশ আর সমাজের চেহারা সে ওই আড়াল থেকে দেখেছিল তা মানুষকে দমিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সে ছিল ডাকাবুকো, অত সহজে ভেঙে পড়বার পাত্র নয়। তাকে ওঁরা খুব যত্ন করেই মানুষ করেছিলেন। চার বছর পর্যন্ত হসপিটালে। তারপর নার্সারি, ক্রেশ, সন্ধে হলে কনভেন্টে। ওঁদের বারাসতে অরফ্যানেজ আছে। কিন্তু সুমনাকে ওঁরা সেখানে রাখেন নি। সিস্টার জেন আর সিস্টার সুচরিতার ঘরে সে বড় হয়েছে। তারপর হস্টেল। নিজেদেরই ক্যাম্পাসের মধ্যে হস্টেল। হস্টেলের বন্ধুরা যে যার সময় পার হলে বাড়ি ফিরে গেল। সে স্কুলবোর্ডিং থেকে কলেজ হস্টেল তারপর অচেনা পৃথিবী। সুমনা, তোমার কেউ নেই, তোমার শুধু তুমিই আছো। এই মন্ত্রটা সে ক্রমাগত জপ করে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলে। রাত্তিরবেলা শোবার আগে প্রার্থনা করাও তার কনভেন্টের অভ্যাস। সে সময়েও ওই একই মন্ত্র সে জপ করে— সুমনা তোমার কেউ নেই, তোমার শুধু তুমিই আছো। তবে ওই দুবারই। বিষণ্ণ থাকা তার স্বভাব নয়। সারাদিনটা সে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে। সকালে উঠে নিজের খাবারটা নিজে করে নেওয়া। তারপর চান-টান করে তৈরি হওয়া, আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেওয়া, কাঁধ পর্যন্ত স্টেপ কাট ঢেউ খেলানো চুল, অ্যাথলিট চেহারা, খুব ফিট। পাঁচ সাত মতো হাইট হবে তার। রঙটা উত্তরাধিকার সূত্রে খুব উজ্জ্বল পেয়েছে, মুখশ্রী ভালো। কিন্তু তার আসল সৌন্দর্য হল স্বাস্থ্য। সপ্রতিভতা, শিক্ষার, আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি, এবং তার অজেয় মনোভাব। কিছুদিন আগেই মল্লিকা বলছিল— য়ু নো হোয়াট আই লাইক অ্যাবাউট য়ু বেস্ট? ইয়োর পজিটিভ অ্যাটিটিউড, য়ু হ্যাভ নিদার এনি কমপ্লেক্স, নর এয়ার্স।

অনাথ, আত্মীয়পরিজনহীন, সন্ন্যাসিনীদের আশ্রয়ে ও করুণায় বড় হয়ে ওঠা একটি মেয়ের পক্ষে এগুলো খুব কম প্রশংসা নয়!

সুমনা বছর দুয়েক হল কনভেন্ট ছেড়েছে। কিন্তু এখনই পর্যন্ত যত জনকে

দেখেছে, যত জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সবাইকেই তার ভালো লাগে। মিসেস রডরিগন্স, ওঁর নাকটা একটু বেশি লম্বা, সুমনা ভাব দেখায় ও তাঁর সব কথাই মানছে খুব। উনি তাতেই খুশি। প্রথম প্রথম তার অনাথত্ব নিয়ে উনি খুব অপবিত্র কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। খুবই।

— তাই তো! তোমার তো খুব কষ্ট সুমনা, মা বাবার নাম পর্যন্ত জানো না।

— কে বললে জানি না! মায়ের নাম সুরমা মণ্ডল। বাবা অনন্তনাথ মণ্ডল।

— তাই বলো। কী বলে ওকে? বে আইনি, ইললিগ্যাল চাইল্ড নও তাহলে! নট দ্যাট আই মাউন্ড, বুঝলে? সকলেই ঈশ্বরের পুত্র-কন্যা আমার চোখে।... আনফর্চুনেট, ভেরি আনফর্চুনেট!

ওর ভালো লাগে নি। কী করে লাগবে! কিন্তু ও কথাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। সিস্টার সুচরিতা আসার আগে একদিন একান্তে বলেছিলেন, সুমনা নিজের জন্ম, এই যে তুমি পিতৃমাতৃহীন...এ নিয়ে বাইরের পৃথিবীতে কিছু কুৎসিত কৌতূহল, বাঁকা মন্তব্য তুমি শুনতেই পারো। সেগুলো নিয়ে অনর্থক ক্রুড করো না। তোমার অবশ্যই পরিচয় আছে। হসপিট্যালের রেজিস্টারে এনট্রিটা তোমাকে দেখিয়েছি আমরা শুধু তোমার মনে বিশ্বাস জাগাতে কিন্তু এখন তুমি বড় হয়েছো তোমার বোঝা উচিত, ইললিগ্যাল কথাটার মধ্যেও শিশুর সম্পর্কে কোনও অসম্মান থাকার কথা নয়।

— তাহলে কি আমি ইললিগ্যাল সিস্টার? আমাকে ভোলাবার জন্যে...

— নো, নো, হাজারবার না সুমনা। এবং ওইজন্যেই তোমাকে অরফ্যানেজে না রেখে আমরা নিয়মবহির্ভূতভাবে নিজেদের মধ্যে রেখে বড় করেছি। আমি তোমাকে বোঝাতে চাইছি ইট ডাজ নট মেক এনি ডিফারেন্স। এই ধরো, বারাসতের অরফ্যানেজে এমন অনেক শিশু আছে, যাদের বাবা-মা পালন করতে না পেরে আমাদের কাছে নিঃশর্তভাবে দিয়ে দিয়েছে। তাদের লিগ্যাল হয়েই বা কী লাভ হল?

মিসেস রডরিগস এর কৌতূহলে উত্তেজিত না হয়ে হাসিমুখে কদিন জবাব দিতেই উনি মিইয়ে গেলেন। এখন তো উনি তাকে রীতিমতো পছন্দ করেন। উপদেশ বর্ষণ করে যান, তুমি কোনও ফ্যামিলির মধ্যে বড় হওনি তো, কে আর তোমাকে সাবধান করবে, কটা কথা বললে নিশ্চয় কিছু মনে করবে না।

— না না, বলুন না।— সুমনা বললো না সাবধান করার বিষয়ে মঠগুলো পরিবারের থেকে কিছু কম যায় না।

— মানে বুঝলে, এই ইয়াং মেন সব আজকালকার, একদম বাজে রদ্দি। মিশতে তোমাকে হবেই। কিন্তু খুব সাবধানে মিশবে। কারো কথায় ভুলবে না একদম। দে আর ফুল অব প্রমিস। রেসপনসিবিলিটি নেবার বেলায় টুঁ টুঁ। অ্যান অপরচুনিস্ট লট, ফিকল্, সেলফিশ অ্যাজ লং অ্যাজ পসিবল নো ডেটিং। বুঝলে তো! ডেট করতে চাইলেই আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি খোলনলচে উল্টে-পাল্টে দেখে নেবো

তারপর চুজ সামবডি স্টেব্‌ল্‌, ফেয়ারলি মানিড, অ্যান্ড সেট্‌ল্‌ ডাউন। আরেকটা কথা, কারো কথায় কখনো চাকরি ছাড়বে না। বুঝলে? এই আমি ছেড়েছিলাম। তারপর ফটাস করে মিঃ রডরিগস মারা গেলেন। ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে। কী করি? চাকরি আর পেলুম না। অন দা রং সাইড অব ফর্টি। লজার নিতে শুরু করলাম। এখন ছেলে ম্যারিনে আছে। ভালো আয় করে। আমাকে পাঠায়। চুপচাপ ইনভেস্ট করে দিই। আমার নিজস্ব রোজগার এই লজিং— এ আমি ঈশ্বর যতদিন না আমায় ডেকে নিচ্ছেন করে যাবো।

খুবই বাস্তববোধসম্পন্ন মহিলা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলেন, সে কান পেতে শোনে। কোনও মন্তব্য করে না।

লাঞ্চের সময়ে ডাইনিং হলে একসঙ্গে বসতে বসতে সরিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে তার বেশ আলাপ হয়ে গেছে। বয়স হয়তো সবে ত্রিশ পার হয়েছে কি না হয়েছে। সরিৎদা একজন দুর্দান্ত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। খুব আন্তরিক এবং ভদ্র। কোনদিন তার কনভেন্ট তার ব্যাকগ্রাউন্ড, জন্মবৃত্তান্ত এসব নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন না। সরিৎদার ম্যান-ম্যানেজমেন্ট এত ভালো যে যতদিন উনি এসেছেন অর্থাৎ গত তিন চার বছর এই হোটেলে যেমন কোনও লেবার প্রবলেম নেই, তেমন কর্মীদের কাজকর্মে ভদ্রতায় কোনও গাফিলতিও নেই। বেয়ারা, বেল-বয়, জমাদার সব রকমের হাউজস্টাফ কেউ এমন নেই, যাকে উনি নিজের ব্যবহার দিয়ে জিতে নেননি। মাঝে মধ্যেই টুক করে রিসেপশন ডেস্কে দাঁড়াবেন। কোনও বিশেষ পার্টি এলে তো আসবেন বটেই। ব্যাংকোয়েট হল কনফারেন্স রুম কেউ ভাড়া নিলে উনি নিজে তদারকি করবেন দাঁড়িয়ে। আরও ভালো ভালো রেস্তোরাঁ থাকতেও এই ফোর স্টার হোটেলের আতিথ্যের বিশেষ সুনাম আছে এটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বেশ ভালো বুঝতে পারে সুমনা। জার্মানি থেকে কেউ ফোন করছে, তার ইংরেজি বোঝা দুঃসাধ্য— সরিৎদা এসে জার্মানে কথা বলে তাঁর রুম বুকিং, ছোট কনফারেন্সরুম বুকিং সব করে দিয়ে গেলেন। বেশির ভাগ অন্য প্রদেশীয় বা বিদেশীয়রা ফোন করেই বলেন ওঁদের কোনও চেনা পরিচিত এখানেই রেকমেন্ড করেছেন ওঁদের। সরিট বিশওয়াস নামে সামবডি আছেন না এখানে ম্যানেজার?

এই সরিৎদাকেই সে একদিন মিসেস রডরিগস-এর গেস্ট হাউজে ডেকেছিল। ওঁকে আর মল্লিকাকে। থাই রান্না করে খাওয়ালো। এই কুকারি কোর্সটা ও নিয়েছিল তার পরীক্ষা হল সেদিন। মিসেস রডরিগসও নিমন্ত্রিত ছিলেন। খেয়ে সবাই খুব খুশি। ওরা চলে যাবার পর রাতে মিসেস রডরিগস এসে বললেন— ডিপেন্ডেব্‌ল্‌। য়ু ক্যান গো অ্যাহেড।

— আরে? কী বলছেন রডরিগস মাসি?

— ওই যে বিশ্বাস! হি ইজ গুড।

ঠোঁট কামড়ে সে বললো— একটু বেশি বেশি না?

— এই তো তোমাদের দোষ। এইসব আজকালকার মেয়ে তোমরা, নটি গার্লস, তোমরা ফ্লার্টিং, মিসচীফ...এই সব ভালোবাসো। দ্যাট ল্যান্ডস ইউ ইন ট্রাবল, মাইন্ড য়ু।

সে বললো না— এই সরিৎদাকে তার সত্যিই দাদা মনে হয়। তার জোর ফ্লু হয়েছিল। তিনদিন যেতে পারেনি। দ্বিতীয়দিনেই এসে খোঁজ নিলেন। বললেন— ফ্লু জিনিসটাকে কখনো লাইটলি নেবে না। প্যারাসিটামল খেয়ে জ্বর কমালে শুধু হবে? নিজের গাড়িতে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন।

ফেরার সময়ে মুচকি হেসে সুমনা বলেছিল— আপনার ম্যান ম্যানেজমেন্টে এটা আছে নাকি সরিৎদা?

খুব স্মার্ট। ঘাবড়ালেন না। হেসে বললেন— ম্যানের আগে একটা হিউ বসিয়ে নাও, আর বুঝতে অসুবিধে হবে না।

কখনও মল্লিকার সঙ্গে কখনও সরিৎদার সঙ্গে সে সিনেমা দেখে। আর বাড়ি বসে টি.ভি.র নব ঘুরিয়ে টেনিস। হোটেলেও রিসেপশন কাউন্টারের উল্টো দিকে একটা টি.ভি.সেট উঁচুতে বসানো আছে কোণাকুণি। সেটাতেও বেশির ভাগ সময়ে স্পোর্টস চ্যানেল ধরাই থাকে।

সেদিনও সকালে বোর্ডাররা অনেকেই কাউন্টারে চাবি রেখে বেরিয়ে গেছে। সে একাই বসে খাতা থেকে কমপিউটারে তুলছিল তথ্যগুলো।

ক্যান আই মীট সরিৎ বিশ্বাস।

গলার স্বরটা দারুণ, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই গান টান করেন মনে করে সে মুখ তুলে দেখে তার সামনে একটি রীতিমতো রূপবান যুবক দাঁড়িয়ে। বডি-বিল্ডিং-টিং করে বোধহয়। একেবারে বেতের মতো চেহারা, মুখটা এত ছেলেমানুষি মাখানো যে মায়া হয়।

—জাস্ট গো ইনসাইড দা রুম অন দা লেফ্‌ট্।

ছেলেটি চলে গেল। স্টেপগুলো নিলো স্প্রিং-এর মতো।

মিনিট দশেক পরে সরিৎ যুবকটিকে নিয়ে কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এলো। দুজনে কথাবার্তায় মগ্ন। নিশ্চয় সরিতের খুব বন্ধু।

— টেনিস আছে সাউথ ক্লাবে, যাবে নাকি? যুবকটি বললো।

— এখনও টেনিসে টিকে আছো? সরিৎ জবাব দিল, দুজনেই হো হো করে হাসছে। সুমনা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু কানে আসছে কথাগুলো।

ছেলেটি বললো— ফ্রম হকি টু ক্রিকেট, ক্রিকেট টু টেনিস এটা তো স্বীকার করবে রঞ্জন নারায়ণ মুখার্জি একজন অলরাউন্ডার ইন এভরি সেন্স অব দা টার্ম। চট করে চোখ তুললো সুমনা। কথার শেষে সরিতের দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা টিপলো ছেলেটি। সরিৎ বললো— তোমার অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

গ্রো আপ মাই ফ্রেন্ড। বয়সটা কমছে না বাড়ছে?

উত্তর এলো— বাড়ছে? হাসালে সরিৎ আ অ্যাম জাস্ট ইয়োর এজ, টোয়েন্টি এইট, বাট আই লুক ইয়ংগার।

সুমনা এবার মুখ তুলে তাকালো। সত্যিই কিন্তু তার মনে হয়েছিল এ ছেলে তাদের সমসাময়িক হলেও হতে পারে। চোখাচোখি হয়ে গেল। যুবকটি বললো— হাই!

সে-ও বললো— হাই! তারপর কাজে মনোনিবেশ করলো।

রঞ্জন বললো— তাহলে আসছো তো সরিৎ? রিমেমবার দোজ ডেজ উই ইউজড্ টু বি পার্টনার্স...

— অর রাইভ্যালস্! রাইট!

রঞ্জন ছেলেটি হেসে সরিতের কাঁধে একটা থাবড়া মারলো— বেশ, যেটা তোমার পছন্দ। পার্টনারশিপ, রাইভ্যালরি দুটো চয়েসই রইলো। এসো কিন্তু, জোর খেলা হচ্ছে।

কয়েক পদক্ষেপে কাচের দরজার কাছে পৌঁছে গেল রঞ্জন, বেরিয়ে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে সুমনার দিকে চাইলো, বললো— সি ইউ!

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে ভালো করে একবার চান করে নেয় সুমনা। এটা ওর বহুদিনের অভ্যেস। আসলে প্রতিদিনই, স্কুলই হোক কলেজই হোক, বিকেলবেলা খানিকটা গা সে ঘামাবেই। কোনও খেলা না হলে অন্তত দৌড়। তাই বাড়ি ঢুকেই আগে চান। জীবন পাল্টে যায়। অভ্যেস পাল্টায় না। সে কি জানতো তার এইরকম একটা স্থাণু চাকরি হবে! সারাদিন, কাউন্টারের পেছনে, পাশে কমপিউটার। একের পর এক অতিথির সঙ্গে ভদ্রতা ও হাসি বিনিময়। নাঃ সে ভাবে নি। ট্রেনিং! ট্রেনিং বিনা, আরও ডিপ্লোমা ডিগ্রি বিনা সে কী-ই বা করতে পারে আর! আর চাকরি মানেই বোধহয় এইরকম স্থাণুত্ব। সবই তো ডেস্‌ক ওয়ার্ক। এক যদি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়া যেত, ট্রাভলিং সেলসম্যান...।

ঘরে পা দিতে দিতে সে আপন মনেই বলছিল— ওহ্ তোমাকে বড্ড মিস করছি। বড্ডই।

রুচি— আরেকজন বোর্ডার, বোধহয় বাইরে দিয়ে যাচ্ছিল, গলা বাড়িয়ে বললো— কাকে! কোন সে ভাগ্যবান বয়ফ্রেন্ড ভাই!

সুমনা বললো— মারো গোলি বয়ফ্রেন্ডকো। আমি টেনিসের কথা ভাবছিলাম। এসো না!— সে দরজাটা ভালো করে খুলে ধরলো। বললো— আমার খেলাধুলোর বারোটা বেজে গেল এই চাকরি করতে গিয়ে। না খেললে তখন খিদে হত না, ঘুম হত না।

রুচি হেসে বললো— বেশ। চাকরিটা ছেড়ে দিলেই তো হয়।

— দানাপানি? সুমনা মুখে একটা মজার ভঙ্গি করে বললো— কীধর মিলেগা ভাই?

রুচি বললো— কেন? টেনিস ফেনিসে তো মিলিয়ন মাল্টি-মিলিয়ন ডলার ঘোরাফেরা করে শুনতে পাই।

হেসে ফেললো সুমনা।

— বাঃ হাসির কী হল?— রুচি একটা চেয়ারে গুছিয়ে বসে বললো।

— আরে রুচিদিদি টেনিস মানেই কি স্টেফিগ্রাফ কি শারাপোভা? স্রেফ ভালোবাসা খেলাটার জন্য। গভীর ভালোবাসা। অনেক খেলার জন্যেই। খেলাই আমার সবচেয়ে বড় রিল্যাকসেশন বলো রিল্যাকসেশন, রিক্রিয়েশন বলো রিক্রিয়েশন। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে যে টিনের মগ হাতে রাস্তায় বসে যেতে হবে!

তোয়ালেটা মাথায় জড়ানো ছিল। এখন খুলে নিয়ে চুলগুলো আরেকবার মুছে নিয়ে মাথা ঝাড়া দিল সুমনা।

রুচি বললো— একেবারে টিনের মগ? ছদ্মবেশটাও তো নিতে হবে তাহলে! শিওর— সুমনা বললো - ধরো একটা উলোঝুলো পরচুলা, ফাইন সব বলিরেখা মুখে, হাতটাতগুলো চিরকুট্টি একটা কাপড়ে ঢেকে রাখতে হবে। কত অ্যাক্টিং করেছি! একবার গো অ্যাজ য়ু লাইক-এ রাণী রাসমণির স্ট্যাচু হয়েছিলাম, দেড় ঘণ্টা একঠায় বসে।

কথা বলতে বলতে সে টি.ভি. সেটটার দিকে এগিয়ে যায়। নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোনও একটা টেনিস টুর্নামেন্টের রিপ্লে খুলে বসে পড়ে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে— ফল্ট, ডাবল্ ফল্ট— দূর, সামপ্রাস তো সার্ভেই জিতে যাবে।

রুচি বললো— কী যে আগডোম বাসডোম বকিস। ধুৎ, সে চলে যায়।

সুমনা লক্ষ্যই করে না বন্ধুর প্রস্থান। আর হঠাৎ মনে পড়ে যায— হাঃ হাঃ ফ্রম হকি টু ক্রিকেট, ক্রিকেট টু টেনিস...অলরাউন্ডার ইন এভরি সেন্স অব দা টার্ম!— কী যেন সরিৎদার বন্ধুর নামটা! রণেন...রণেন্দ্র...কীরকম জমিদার জমিদার নাম ধুৎ একদম মনে পড়ছে না। রণেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি...ওঃ হো রঞ্জননারায়ণ। কী লাকি! খেলাধুলোয় আছে। পার্ফেক্ট স্পোর্টসম্যান! আর সেইজন্যেই ওরকম চাবুকের মতো চলাফেরা। সেইজন্যেই সরল দেববদূতেব মতো মুখ। চট করে দেখা যায় না। কী লাকি! ইশশ্...

২

স্কুলকলেজের দিনগুলো মনে পড়ে যায় সরিতেরও। যদিও সে স্কুল কলেজি জীবনদর্শন থেকে অনেকটাই দূরে সরে এসেছে। পরিণতমনস্ক হয়ে উঠেছে। তবু! রঞ্জনকে দেখে মনে পড়ে গেল। তাদের যৌথ পরিবার। নিজের তিন ভাই এক দিদি। স্ট্রাগল একটা ছিলই। যৌথ পরিবারের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলার স্ট্রাগল। বাবা-মার উচ্চাশা পূর্ণ করার স্ট্রাগল। মেজ ছেলে হবার দরুণ দাদা বিদেশে চলে যেতে তার অনুরূপ আকাঙ্ক্ষাকে মূলেই বিনষ্ট করতে হল। সে অবশ্য দাদার মতো বিদেশে বসবাস করার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। সে বাবা-মার দিকটা ভাবতো। তবে বিদেশে যাবার ইচ্ছে ছিল। ছোটভাই বলতো— তুই পিকিউলিয়র মেজদা। কেন কী বৃত্তান্ত কখনও বিশদ করে বলেনি। বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পরে তাদের যৌথ বাড়ি ভাগ হল। বাবা মারা যেতে পাইকপাড়ার বাড়ির ভাগ বিক্রি করে মা আর ভাইকে নিয়ে সে সি.আই.টি. রোড পদ্মপুকুর এলাকায় চলে আসে। ভাই এখন চাকরিতে সাময়িক ইতি দিয়ে বাঙ্গালোরে এম.বি.এ. পড়ছে। সে আর মা। সরিৎ বুঝতে পারে ভাই বাইরে কোথাও চাকরি নিয়ে থাকতে পছন্দ করবে। এটা কেন মনে হয়, যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না। একটা অনুভূতি। কেউ যদি পাঁচজনের দায়িত্ব নিতে শুরু করে তখন আর যারা আছে তারা দায়িত্ব যত দূর পারে ঝেড়ে ফেলে। এ রকমটাই তার অভিজ্ঞতা। এই নিয়ে সে ভাবে না। তাছাড়া মা বাবা ভাই বোন এগুলোকে সে দায়িত্ব হিসেবে দেখে না, সম্পর্ক হিসেবেই দেখে। কিন্তু জয়পুরে একটা দারুণ প্রোমোশন তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হল। মাকে একা থাকতে হবে। সে হোটেলের ভেতরেই কোয়ার্টার্স পাবে, সেখানে মায়ের অসুবিধে হবে। বন্ধু বান্ধবেরা বলে থাকে ওহ সরিৎ! স্যাক্রিফাইসিং টাইপ! সরিৎ এটাকে ঠিক স্যাক্রিফাইস বলে ভাবে না। মায়ের অসুবিধেটা তো তারও অসুবিধে! চাকরি করা কেন? সকলে মিলে আনন্দে থাকা যাবে বলে। সকলের মধ্যে মা তো প্রধান। ভাই যদি এখানে চাকরি নিত সে কিছুদিন জয়পুর ঘুরে আসতে পারতো। আরেকটা বড় লিফট্ নিয়ে কলকাতায় চলে আসা খালি সময় ও ইচ্ছের ব্যাপার। উচ্চতম জায়গায় পৌঁছোতে গেলে একটু ঘোরাফেরা করতে হয়। সেইটা তার সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

একসময়ে ভালোই খেলাধুলো করতো। এখন এই হোটেল ম্যানেজমেন্টের কেরিয়ারটার এত দাবি যে সময় করে উঠতে পারে না। রঞ্জন কিন্তু খেলছে, খেলে যাচ্ছে। লাকি গাই। ওর এত সম্পত্তি যে ও যেমন খুশি জীবনটা কাটাতেই পারে। ইচ্ছেমতো খেলে বা পড়ে বা বেড়িয়ে। রঞ্জন ন্যাশন্যালসে নামছে এটা তার কাছে খবর। গ্র্যাজুয়েশন শেষ না করেই ও ইংল্যান্ড চলে গেল। কী পড়তে গেল না গেল সে জানে না। কোনও ধারণাই নেই। হঠাৎ উদয়— একেবারে ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়নশিপ

খেলছে! আশ্চর্য! কাজ শেষ করে সাউথ ক্লাবে যখন পৌঁছলো তখন সাত নম্বর কোর্টে খেলছে রঞ্জন। শেষের দিকে জেতার মুখে। গ্যালারি হাততালিতে ফেটে পড়ছে। অন্য ছেলেটি সাউথ ইন্ডিয়ান, রেড্ডি। বয়স বেশ কম। রঞ্জন কিন্তু জিতছে। আসলে ও অসম্ভব বেপরোয়া, ভীষণ সাহসী, নার্ভ কাকে বলে জানে না। ওর ধরনটা হল— জিতবো, জিততেই এসেছি।

তোয়ালে কাঁধে ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরছে রঞ্জন। সরিৎ এগিয়ে এসে হাত ঝাঁকালো— কংগ্র্যাট্‌স্।

— ওহ তুমি এসেছো! রঞ্জন খুশি হয়ে বললো— ফার্স্ট রাউন্ড তো সবে হল, রেড্ডি ইনএক্সপিরিয়েন্সড্। এর মধ্যেই নো কংগ্র্যাটস। সেভ ইট।

সরিৎ— রেড্ডি ইজ নট ব্যাড দো। প্রমিসিং। তারপরে তোমার খবরাখবর কী? লন্ডন থেকে কবে ফিরলে?

রঞ্জন— ওহ্ বহুদিন। দিব্যি দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল, রোম্যান্টিক, ফুল অব অ্যাডভেঞ্চার... দেবী ডাক পাঠালেন। আর ব্যারিস্টার হতে হবে না। ফিরে এসো।

সরিৎ— ও তুমি ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিল? শেষ করলে না? যাঃ।

রঞ্জন— আচ্ছা সরিৎ, কামন্ ম্যান তুমি ভাবতে পারো, কালো জোব্বা পরে আমি কোর্টে সওয়াল করছি?

সরিৎ— ক্ষতি কী? আন্যান্য পেশার মতোই একটা পেশা। প্রেস্টিজিয়াস, পেয়িং।

রঞ্জন— যদি তোমার তাতে মন বসে— ইয়েস আর নো!

সরিৎ— যদি পছন্দ না হয়েছিল তো অ্যাট্ অল গিয়েছিলে কেন?

রঞ্জন গলা ছেড়ে হেসে উঠলো— আরে বুড়িকে টুপি পরিয়ে বছর পাঁচেক তো ইউরোপ ঘুরে আসা গেল!

সরিতের হাসিটা ভালো করে ফুটলো না। সে বললো— তোমার ইলাসট্রিয়াস ঠাকুমার কী খবর?

মুখোমুখি বসলো দুজনে। রঞ্জন শাওয়ার নিতে যাচ্ছে। যেতে যেতে বলে গেল— অ্যাজ ইলাসট্রিয়াস অ্যাজ এভার। ডমিনেটিং ওল্ড ফুল।

রঞ্জনের ঠকুমার কথা কিছু কিছু জানে সরিৎ। বিশাল ধনী। নাতিদের জীবনে একমাত্র অভিভাবক। রঞ্জনের কথাবার্তায় কখনও মনে হয় বুঝি রূপকথার ডাইনি। কখনও মনে হয় সেই ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ডের ডাচেস-টাচেসের মতো। দুটো ছবির মধ্যে থেকে সত্যি ঠাকুমাকে চিনে নিতে খুব অসুবিধে হয়। ঠাকুমা বলতে যে চেহারাটা ভাসে তার সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যায় না।

রঞ্জন চান করে বেরিয়ে এলে সে যেন আগেকার কথার জের টেনেই বললো— আচ্ছা রঞ্জন যে ভদ্রমহিলা তোমাকে এভাবে মানুষ করলেন, নাতি বলতে যিনি পাগল, তাঁকে ওল্ড ফুল টুল বলাটা...টুপি ফুপি পরানো...

রঞ্জন বললো— আঁরে ওটা আদর। ওল্ড ফুল মানে কী বলো তো! জাস্ট বুড়ি। বুড়িয়া...। আদর করেই বলছি, তবে কতদিন বলতে পারবো জানি না।

সরিৎ জিজ্ঞেস করলো— মানে?

রঞ্জন হাতের একটা ভঙ্গি করে বললো— আরে ছোড়ো ইয়ার। ইয়াং ম্যান, এখন ঠাকুমা দিদিমা...ধুৎ সময় নষ্ট। এখন হোটেলে ফিরবো। কষে একটা সাঁতার দেবো। কাল সজ্জনের সঙ্গে খেলা, সজ্জন সিং। ভীষণ টেনাসিটি।

সরিৎ বললো— হোটেলে কেন? তোমার সেই থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাট কী হল?

রঞ্জন বিরক্ত একটা মুখভঙ্গি করলো, বললো— তবে আর বলছি কী! তার চাবি বুড়ি আমায় দেয়নি এবার। কলকাতায় আসা খুব অপছন্দ। ওখানে থাকতে হবে সারাবছর। এস্টেট চালানো শিখতে হবে। ক্যান য়ু বিলিভ ইট? আরে বাবা তাহলে হস্টেলে রেখে বেস্ট স্কুল কলেজে পড়ালো কেন? ওইখানে জংলি নায়েব-গোমস্তা হতে হলে এত কী দরকার!

সরিৎ চিন্তিতমুখে বললো— তুমি বুঝিয়েছো?

— বুঝোই নি? বলে সবই নাকি এস্টেটের ওভারল তদারকির জন্যে লাগবে।

— ওভারল তদারকি...তুমি কেন? তোমার ওপরেও তো দুই দাদা।

— ওদের তো যুতে দিয়েছে। দাদা এলাহাবাদ, কানপুর...রিয়্যাল এস্টেট। মেজদা আছে শিলিগুড়ি, ছোট কলকাতা-সুন্দরবন করছে সমানে। সে বটানি পড়েছে। সুন্দরবনে হাজার রকম স্টাডির খোরাক পায়। তা তাকে বসাও না, কী যে বুড়ির বাই। আমাকে না দেখে উনি নাকি থাকতে পারেন না।

সরিৎ বললো— আনফর্চুনেট। তবে উনি আর কতদিন? আশি টাশি তো হল!

রঞ্জন তেতো হাসি হাসলো একটা— আশি এখনও হয়নি, তবে আশি-নব্বুই-একশ হতেই বা অসুবিধে কী? বুড়ির মাসিওর, ইয়োগা, ফোসিয়্যাল সব আছে, হুইল চেয়ারে বসে গেছে তাই, নইলে বয়স বুঝবে না। চলো না একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি, কী জিনিস!

— লোভ হয় দেখে আসতে, তা যদি বলো রঞ্জন। একজন আশির কাছাকাছি মহিলা একা সুন্দরবনের একটা দ্বীপে বসে সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন, রির্মাকেব্‌ল্‌। তোমাদের কারো মধ্যে এই ক্ষমতাটা উনি বোধহয় দেখতে চান বা তৈরি করে দিয়ে যেতে চান।

— টু হেল উইথ ইওর ক্ষমতা সরিৎ— ইন দ্যাট কেস— আমি না হয় তোমার নামটাই ওঁর কাছে রেকমেন্ড করে পাঠাই। কী বলো? রাজি?

সরিৎ একটু অন্যমনস্ক হাসলো। বললো— নিজের রক্ত যখন নিজেকে বোঝে না চেনে না...আনফর্চুনেট। রঞ্জন আমাকে দিয়ে ওঁর কাজ হবে না, কাজটার জন্য উনি নিজের রক্তের সম্পর্ক চাইছেন। এইটাই তুমি বুঝছো না। আচ্ছা আজ চলি। উইশ ইউ

অল সাকসেস।

বাইরে বেরিয়ে এলো সরিৎ। ঝকঝক করছে আজ রাস্তাঘাট। প্রাক-ডিসেম্বরেও বৃষ্টি পড়ে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে। গরমের ভয়াবহতা নেই। কিন্তু শীতও নেই তাই বলে। অদ্ভুত ছেলে এই রঞ্জন। বিশাল ধনী ঘরের ছেলেরা যেমন হয়। সেই অহঙ্কার, বেপরোয়া ভাব, কিন্তু এটা তো স্বীকার করতেই হবে যে সে আপাদমস্তক খেলোয়াড়। নানা বিষয়ে রঞ্জনের শখ, আগ্রহ। এটা তো ওরা অনেকদিন থেকেই জানে। অ্যাস্ট্রনমি। তারা দেখতে ভালোবাসে রঞ্জন। ও বিষয়ে পড়াশোনাও যথেষ্ট। এটা রঞ্জনের একটা গভীরতার দিক। স্কুল কনসার্টে পিয়ানো বাজাতো রঞ্জন, দারুণ গলায় গাইতো। মেয়েরা তো বটেই ছেলেরাই রঞ্জন বলতে পাগল ছিল। অথচ এত খেলাধুলো গানবাজনা, আকাশবিজ্ঞান সব গুলোই শুধু শখ, শখের চর্চা। শখের চর্চা করতে করতেই ন্যাশন্যালস্-এ খেলতে চলে এলো। তাহলে সত্যিকারের চর্চা করলে কী না হতে পারতো! জীবিকা অর্জনের তাড়া বোধহয় আমাদের সবচেয়ে বড় তাগিদ। আজকাল। যাতে সত্যিকার আগ্রহ বা ভালোবাসা আছে সে সব পেছনে ফেলে কিসে উপার্জন বেশি হবে, সামাজিক মানমর্যাদা ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এই তাড়াই আমাদের অন্যদিকে নিয়ে চলে। সে নিজে তো চুপি চুপি কবিতা লিখতো, লিটল ম্যাগাজিনে বারও হত সেগুলো। একটা সময় কবিতা ছিল দারুণ একটা প্যাশন। পাগলের মতো পড়তো। কিন্তু কখনও ভাবতে পারেনি, অন্য কিছু না করে কবিতা চর্চাতেই মন দেওয়া যাক। বললে, লোকে পাগল ভাবতো। সেই অখ্যাত কিন্তু হতে-পারতো সার্থক কবি পরিষেবার চাকরিতে চলে এলো। ভেবে দেখতে গেলে এটা কি একটা জীবিকা হল? চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ এসব হবার জন্য হয়তো কবিতা বিসর্জন দেওয়া যায়, কিন্তু পেশাদার আতিথেয়তা? এটা কি একটা যথেষ্ট কারণ হল? ক্ষতিপূরণ হল? রঞ্জন সোনার চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছে। জীবিকার তাড়না নেই। এটা যে কত বড় ভাগ্য! নিজের পছন্দমতো গ্রহ তারা দেখে। টেনিস খেলে, গান করে শুনে জীবন কাটানোর যে সুযোগ সে পেয়েছে তার সদব্যবহার করবে না-ই বা কেন? সবাইকেই কিছু না কিছু হতে হবে তার কী মানে আছে? আসল হল আনন্দ পাওয়া, জীবনটাকে তিলতিল করে উপভোগ করা কী জিনিস সেটা রঞ্জনের চলাফেরা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। শুধু একটাই কথা। একটু অন্তত দায়িত্ব নিতে তোমাকে হবে। আর একটা কথা। তোমার স্বাধীনতা, তোমার উপভোগ যেন অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। সত্যি, নির্দায় উপভোগ ভালো না দায়যুক্ত নিরানন্দ ভালো? বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছোতে পৌঁছোতে সে স্থির করে ফেললো একটা মাঝামাঝি কিছু চাই। এই যে সে আজ বাড়ি ফিরছে, দিদি আর ভাগনে আসার কথা আছে। মায়ের সঙ্গে ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বাড়ির ভেতরে পা রাখলেই পরিচিত প্রিয় কণ্ঠগুলো তাকে ঘিরে ধরবে। মার একটু একা-একা লাগতে শুরু করেছে। দিদি এলে মুখটা একেবারে বদলে যায়। গাড়ি গারাজ করে সে খুশি মনে ওপরে উঠতে লাগলো।

৩

বিকেল হয়ে এসেছে। এইখানে সবসময়ে কৃত্রিম আলো জ্বলে, সময় বোঝা যায় না। ঋতু বোঝা যায় না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুমনা একটা হাই তুললো। রাকেশ একমনে কমপিউটারে কাজ করে যাচ্ছে। ছটা নাগাদ মল্লিকা এসে যাবে। তার ছুটির এখন তেমন ব্যস্ততা নেই। গলার আওয়াজে মুখ তুলে তাকালো। রঞ্জন।

বললো— সরিৎ বিশ্বাসকে পেতে পারি?

সুমনা হেসে ফেললো— পেতে পারেন কিনা জানি না, সেটা সরিৎ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করছে তবে দেখা করতে পারেন, স্যরি, উনি একটু বাইরে গেছেন। এসে যাবেন। ওয়েট করুন একটু কাইন্ডলি।

রঞ্জন কাউন্টারের ওপরে কনুইটা রেখে দাঁড়িয়েছিল। চোখ দুটো চিকমিক করে উঠলো, বললো— সো? রিসেপশনিস্ট হলেই পোকার ফেস হতে হয় না, মাঝে মাঝে মুখোশ নামিয়ে রেখে হাসিঠাট্টা চলতে পারে?

সুমনা বললো— মোটেই পোকার ফেস নয়। তবে হ্যাঁ ফর্ম্যাল তো একটু হতেই হয়। আপনি যেভাবে বললেন— পেতে পারি? যেন আর একটা স্যান্ডউইচ কি কচুরি চাইছেন।

দুজনেই হাসলো। অদূরে রাখা কৌচে গিয়ে বসলো রঞ্জন। পা-টা মাটিতে আস্তে আস্তে ঠুকছে। বারবার ঘড়ির দিকে চাইছে। একটা ফোন এলো। ইন্টারকম। সুমনা কথা বললো, রেজিস্টার স্কুলে দেখলো, ২৭ নম্বরের ভদ্রলোকটি জানতে চাইছেন ৩৩ নম্বরে যাঁর আসার কথা ছিল সেই কুলকার্নি এসেছেন কিনা। কোনও অজ্ঞাত কারণে কুলকার্নি তাঁর আজ দুপুর থেকে বুকিং থাকা সত্ত্বেও এখনও এসে পৌঁছোন নি। সে ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করলো। এলেই জানাবে।

রঞ্জন উঠে এলো— আর কতক্ষণ বসবো মাদমোয়াজেল! আপনার সরিৎ কি সত্যিই জল হয়ে গেল?

মৃদু হেসে সুমনা বললো— প্লিজ, আর একটু। উনি এসে যাবেন।

রঞ্জন ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললো— আচ্ছা মাদমোয়াজেল বলে ভুলটুল করলাম না তো, যদি মাদাম হন। মাফ করবেন।

সুমনা টি.ভি. সেটটা খুললো। নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টেনিসে নিয়ে এলো নাভ্রাতিলোভার খেলা দেখাচ্ছে। সে বললো— মাফ করার প্রশ্ন নেই।

টি.ভি. স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললো— আচ্ছা। আপনার টেনিসে ইনটারেস্ট আছে নাকি?

সুমনা সাইলেন্ট মোডে নিয়ে এলো টি.ভি.টা। বললো— ভীষণ। খেলতাম তো!

— তাই নাকি! সাউথ ক্লাবে একটা টুর্নামেন্ট হচ্ছে। আমি খেলছি। য়ু আর মোস্ট ওয়েলকাম।

সুমনা বললো— ডিউটি...পারবো না! সে যাই হোক অনেক ধন্যবাদ।

পেছন থেকে সরিৎ বললো— রঞ্জন! কতক্ষণ!

রঞ্জন ফিরে দাঁড়িয়ে বললো— বহুক্ষণ। তবে সময়টা টুক করে কেটে গেল শ্রীমতী...

সুমনা হাসিমুখে বললো— সুমনা।

— এই শ্রীমতী সুমনার সৌজন্যে। তুমি কি জানতে শ্রীমতী সুমনা টেনিস ভালোবাসেন।

— কই না! সরিৎ বললো।

এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। হাতে করে একটা ব্যাগ টেনে আনছেন। সুমনা তাকালো, ইনিই সম্ভবত বহু প্রতীক্ষিত কুলকার্নি। সে ব্যস্ত হয়ে গেল।

দরজা ঠেলে নিজের অফিসে ঢুকলো সরিৎ। বললো— বোসো রঞ্জন। সে টেলিফোনে কিচেনে কিছু খাবার-দাবার পাঠাবার কথা বললো।

—বিকেল বেলায়? হঠাৎ?

রঞ্জন একটু উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো— ভাবতে পারো বুড়ি জোর করে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

সরিৎ হেলান দিয়ে বসলো, বললো— করতেই পারেন। তোমার তো বিয়ের বয়স হয়েছে? না কী?

আরে সৌভিকের হয়নি? তার দিক না, আসলে বয়স-ফয়স কথা নয়, আমাকে খাঁচায় পুরতে চাইছে। সৌভিকের দিকে। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা, বাই নাউ ইট শুড বি ক্লিয়ার টু হার দ্যাট আই ওয়ন্ট টু লিভ মাই ওন লাইফ। তুমিই বলো না, করবো কেন? উনি নাকি কথা দিয়েছিলেন। সো হোয়াট! পাগলা না কি?

— কে? মেয়েটি?

— আরে ওঁর যৌবনের বন্ধু। প্রেমিক হওয়াও অসম্ভব নয়— ভাটিয়া, তাঁর নাতনি।

সরিৎ চোখ দুটো তুলে ওর দিকে এক পলক তাকালো। বললো— অসুবিধেটা হচ্ছে কোথায়? দেখতে খারাপ? সরিৎ জানে রঞ্জন সুন্দরী ছাড়া অন্য মেয়েদের পাত্তার মধ্যেই আনে না।

রঞ্জন খুব আপত্তির সুরে বললো— খারাপ ভালোর প্রশ্ন না। শী হ্যাজ আ টেরিব্‌ল্ ইগো। টেম্পার। রঞ্জন এন মুখার্জি কারো ইগো ফিগোর তোয়াক্কা করে না।

সরিৎ বললো— তাই কি পালিয়ে এসেছো?

রঞ্জন একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললো— নিজে স্বাধীন হবার একটা উপায় খুঁজছি, বুঝলে? একটা জম্পেশ চাকরি!

— ওই অত সম্পত্তি থাকতে?

— কী করে যে এই কথাগুলো বলো সরিৎ? রঞ্জন প্রতিবাদ করে উঠলো— অ্যাম আই আ বেগার? কারো সম্পত্তির তোয়াক্কা করি না। দিলে দেবে, না দিলে না দেবে। আই ওয়ন্ট মাই ফ্রিডম।

সরিৎ একটু ইতস্তত করে বললো— যদি কিছু মনে না করো, এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার একটা অ্যাফেয়ার ছিল না?

— আরে দূর, রঞ্জন হেসে উঠলো— কাফ লভ। রাতদিন ওখানে এসে থাকতো। অ্যাডলেসেন্সের সময়ে একটা রোম্যান্টিক গলো-গলো ভাব হয় না!

— তাতে ক্ষতি কী?

রঞ্জন বললো— দ্যাখো সরিৎ প্রথম কথা আমার ইচ্ছে। ইচ্ছের ওপর আমি কারো জবরদস্তি সইব না। সেকেন্ডলি প্রচণ্ড অহংকারী। ইগো প্রবলেম, বললাম না? একেবারে কাট-অফ করে চলে এসেছি। শী ইজ নট মাই কাপ অব টি। একটু থেমে বললো— ওহ, কান্ট য়ু গেট আউট অব দিস বীস্টলি অফিস!

— ব্যস্ত হচ্ছো কেন, আমি এক্ষুণি বেরোবো। তোমার জন্য চা পাঠাতে বললাম?

— চা! হাসালে সরিৎ। লেটস গো টু সামহোয়্যার এলস। আই নিড কম্প্যানি।

সরিৎ জানে রঞ্জনকে এখন চায়ের জন্য বসিয়ে রাখা যাবে না। ভীষণ অস্থির হয়ে আছে। দূরে বেয়ারাকে আসতে দেখছিল সে, হাত নেড়ে না করে দিল। উঠে দাঁড়ালো। বললো— চলো।

আসলে রঞ্জনের প্রতি তার বন্ধুত্বে কোনও খাদ নেই। আর বন্ধুত্বেও কিছু দায়-দায়িত্ব থাকে।

বাইরে এসে দাঁড়ালো ওরা। সুমনাও ওর ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছে।

— হ্যালো সুমনা রঞ্জন বলে উঠলো ছুটি না কি?

— হ্যাঁ, শেষ। সুমনা হাসলো।

— হোয়াই ডোন্ট য়ু জয়েন আস দেন?

সরিতের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো সুমনা। সরিৎ বললো— সুমনা, আমার বন্ধু রঞ্জন কোথাও একটা নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। আই ডোন্ট নো এ্যাগজ্যাক্টলি হোয়্যার। ও তোমাকে ইনভাইট করছে।

একবার সুমনার দিকে তারপর সরিতের দিকে তাকালো রঞ্জন।

— কী হল? আমি আবার কিছু ভুল-টুল করে ফেললাম না কি? সরিৎ তোমার বস্? ওহ্। স্যরি।

সরিৎ হেসে বললো— দ্যাটস ওকে। আমরা তো বেরিয়ে এসেছি। ওখানে কাউন্টার ফাউন্টার পাঁচজনের সামনে একটু ফর্ম্যাল হওয়াই ভালো।

সুমনা বললো— কিন্তু সরিৎদা এই য়ুনিফর্ম পরে...।

রঞ্জন বলে উঠলো— সরিৎ। আমরা তো সুমনাকে ওর বাড়িতে নিয়ে যেতেই পারি। লেট হার চেঞ্জ দেন...

সুমনা বললো— আজ না হয় থাক। অন্য একদিন...

— কেন? কোনও কাজ আছে?

— তা নয়— সুমনা সরিতের দিকে চাইল।

সরিৎ বললো— কী আশ্চর্য! আমার দিকে চাইছো কেন? চলো, তোমায় বাড়ি নিয়ে যাই।

এই ছেলেটি, মানে সরিৎদার বন্ধু, খুব ছটফটে এবং ইমপালসিভ। যা ইচ্ছে হয়, একেবারে হঠাৎ সেটাই করে ফেলে। সুমনা বললো— অনেক হাঙ্গামা, কী দরকার। আজ থাক না।

রঞ্জন বললো— সরিৎ তুমি বলো না, বলছো না ভালো করে।

— শুনুন সুমনা। ইটস মাই পার্টি। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি। আপনার বস মত দিয়েছেন, আবার কী? এই না আপনি খেলাধুলো ভালোবাসেন? বি স্পোর্টিং।

সরিতের গাড়ি কিন্তু চালাচ্ছে রঞ্জন। উঠেই ঠেলে সরিয়ে দিল সরিৎকে।— এই সরো, হাত নিশপিশ করছে আমার।

— লাইসেন্স সঙ্গে আছে?

— ইয়েস ম্যান এত নিটিরপিটির নিটিরপিটির করে বাঁচো কী করে!

দারুণ হাত। যদিও সন্ধের ট্রাফিকে বারে বারে আটকাচ্ছে গাড়ি। তবু এঁকেবেঁকে ওর ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এমন কায়দায় যেন সাইকেল চালাচ্ছে।

সুমনা বললো— সরিৎদা আমি যদি এর ওপরে একটা শাদা কার্ডিগ্যান পরে নিই?

— গুড আইডিয়া। রঞ্জন বললো। তাহলে আমি স্ট্রেট চললাম।

দক্ষিণ কলকাতার একটা রেস্তোরাঁয় এসে ঘ্যাঁচ করে থামলো রঞ্জন।

— কী সরিৎ কথা বলছো না যে!

সরিৎ হেসে বললো— এতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করে ছিলাম। এখন গাড়ি থামলো, এবার কথা বলা যায়। সত্যি তোমার লাইসেন্স আছে? আমি বিশ্বাস করি না।

— দেখবে? রঞ্জন বললো— তারপর হেসে ফেলে বললো— আরে বাবা, নিটিরপিটির করে বাঁচার কোনও মানে হয় না। কী বলেন সুমনা!

সুমনা বললো— আইন মেনে চলাই তো ভালো।

— বাপ রে। মেমসাহেব প্রথম সুযোগেই বকে দিলেন?

এত দামি জায়গায় সুমনা কখনও আসেনি। ওর ভালো লাগছিল মিউজিক। ভালো লাগছিল ছবি। চারপাশে এত মানুষ। বেশির ভাগই যুবক-যুবতী। জীবন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর যেন জায়গাটা। এই যে এত যুবক-যুবতী...ওদের জীবন কী রকম! বাড়িতে মা বাবা আরও কে কে সব যেন থাকে! ভাই বোন তো বটেই। সেইখানে জন্মে, বড় হতে হতে এইখানে এসে পৌঁছেছে ওরা, তাই ভাবভঙ্গিতে কেমন একটা অনায়াস সাবলীলতা, পায়ের তলার মাটি শক্ত হলে এ রকমটা হয়। অন্যের দয়ায় বোর্ডিং-এ বড় হয়ে এক ঝটকায় অ্যাড এজেন্সির কাউন্টার আরেক ঝটকায় হোটেলের কাউন্টার, ঘুমোনোর জায়গা একটা লজিং-এ রকম হলে জীবনটা কীরকম দেখায় ওরা জানে না। সেও জানে না এইরকম একটা আড্ডা খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি ফিরে মা বাবা এইরকম আপনজনের সঙ্গে দুচারটে কথার আদানপ্রদান, তারপরে সকলের মাঝখানে নিজের নির্জনতায় বাস করতে কেমন লাগে।

রঞ্জন বললো— বিয়ার নিচ্ছি আমরা, আপনি?

— যে কোনও সফট ড্রিংক।

— বলেন কী? রঞ্জন আকাশ থেকে পড়লো— চিল্‌ড্ বিয়ার তার তুলনা আছে? এ যুগের মেয়ে এত স্মার্ট....জাস্ট সফট ড্রিংক? হাসালেন আপনি। ভাবালেনও।

সুমনা বললো— কেন? ভাবনার কী আছে? আমি ড্রিংক করছি না, তাতে আপনাদের অসুবিধে কী! বারণ করছি না তো আপনাদের।

— তা ভাবছেন না, রঞ্জন মুখটা করুণ করে বললো— কিন্তু জাজ করছেন তো! এ লোকটা আজ বিয়ার নিয়ে বসলো, কালই হুইস্কি নেবে...লজিক! সিম্পল লজিক!

— কী আশ্চর্য, সুমনা হেসে ফেললো-- তো খাননা আপনি হুইস্কি, স্মোক করুন, ডিস্কোয় যান তাতে আমি কেন বাদ সাধবো?

— দ্যাটস ব্যাড— রঞ্জন কাঁচুমাচু মুখে বললো— এক তো বিয়ারের পেছন পেছন হুইস্কি স্মোকিং,.... ডিসকো সব লাইন দিয়ে পরপর চলে এলো। তার ওপরে...আমার কিছুতেই আপনার কিছু আসে যায় না! ভেরি ব্যাড্— কী সরিৎ। কিছু বলো।

সরিৎ হাসলো— আমার আবার কী বলার থাকবে! সত্যিই তো, তুমি বা আমি বা সুমনা স্বাধীন অ্যাডাল্ট। যে যার মর্জি মতো চলবো। চলতেই পারি। হোয়াটস দা প্রবলেম?

— আরে আছে, তুমি বুঝছো না। রঞ্জন রীতিমতো উত্তেজিত।

সরিৎ জানে রঞ্জনের এই বৈশিষ্ট্য। ও নিজের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু অন্যের স্বাধীনতার ব্যাপারটা ওর মগজে ঢোকে না। ওর এই ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড জোর

একটা আকর্ষণও বটে আবার বিকর্ষণের কারণও বটে। ওর সঙ্গে কারো ঘনিষ্ঠতা টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। তাই-ই কি ওই মেয়েটি, ভাটিয়া না কী এতদিনে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছিল? অস্বাভাবিক নয়। আত্মসম্মানবোধ থাকলে সর্বক্ষণ অন্যের ইচ্ছেয় তাল দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর অমনি মেয়েটিকে ও ছুঁড়ে ফেলে দিল! এইরকমই কিছু একটা ঘটেছে।

— কী ভাবছো সরিৎ! দূর এই নন-স্মোকিং এরিয়ায় আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। একটু আসছি। ড্রিংকটা এসে গেলে আমায় একটা রিং করে দিও প্লিজ।

রঞ্জন লাফিয়ে উঠল, একটা চিতাবাঘের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ জটলার মধ্যে দিয়ে পথ করে করে চলে যাচ্ছে। সুমনা নিবিষ্টমনে দেখছিল। সুমনাকে দেখছিল সরিৎ। তার কপালে একটা ছোট্ট চিন্তা-ভাঁজ।

সুমনা মুখ ফিরিয়ে বললো— সরিৎদা এই রঞ্জননারায়ণ আপনার কোথাকার কবেকার বন্ধু!

— দুজনেই জেভিয়ার্স-এ পড়তাম। ও অবশ্য হস্টেলে।

— তারপর?

— তারপর ওকে ওর ঠাকুমা ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে কী পড়েছে, কতদূর কী করেছে ও-ই জানে। আর আমি তো জানোই বাবার একগাদা পয়সা খরচ করে।...

সুমনা বললো— তাতে আপনার এমন সংকোচের কী আছে সরিৎদা? ইশ্‌ বাবা-মা থাকলে কত সুবিধে পাওয়া যায়। জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যায়... আমি অবশ্য জানি না সে কী রকম।

চট করে তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকালো সরিৎ। বললো— বাবা-মা না থাকাতেও তো তোমার সত্যিকার কোনও অসুবিধে হয়নি সুমনা। তোমার কনভেন্ট কি তোমাকে যথেষ্ট স্নেহমমতা দেয়নি?

সুমনা ঘাড় নাড়লো। তার চোখ সামান্য চকচক করছে।

সরিৎ বললো— তবে?

— কনভেন্টের কাছে তো আবদারের কথা চলে না সরিৎদা। কিন্তু বাবা মার কাছে চলে। বলা চলে, বাবা আমাকে আরেকটু পড়াশোনা কি ট্রেনিং-এর সুযোগ দাও। বলা চলে, আমি স্পোর্টসই কেরিয়ার করবো বাবা।

সরিৎ চমকে উঠলো— তুমি স্পোর্টস এত ভালোবাসো? কেরিয়ার করার কথা পর্যন্ত...

— হাস্যকর না? সুমনা হাসলো— আসলে বোধহয় সরিৎদা আমি জন্ম রোম্যান্টিক। অজানা অচেনা অনিশ্চিতকে আমি ভয় পাই না, যদি সেটা ভালোবাসি, পারবো কি পারবো না এ চিন্তাও আমার মনে আসে না। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ডু অ্যান্ড

বি হোয়ট আই রিয়্যালি রিয়্যালি ওয়ান্ট।

রঞ্জনের গলার স্বরে দুজনেই চমকে উঠেছে। ইতিমধ্যে ও ফিরে এসেছে। বেয়ারা ফেনাভর্তি বিয়ার রেখে গেল। বললো— হোয়াটস দ্যাট?

সরিৎ বললো— হোয়াটস হোয়াট!

— ওই যে সুমনা বলছিলেন হোয়াট আই রিয়্যালি রিয়্যালি ওয়ান্ট।

সুমনা বললো— মাদমোয়াজেলটা যখন বাদ দিয়েছেন তখন 'বলছিলেন'টা বাদ দিলেও কিছু মনে করবো না...

রঞ্জন বললো— বাঁচালেন। সত্যি ইন্ডিয়ান ভাষার এই তুই, তুমি, আপনি... যাচ্ছেতাই।

ফরাসিতেও আছে কিন্তু। সুমনা বললো।

— ইয়েস, আছে...ঠিকই। তো তুমি ফরাসিও জানো?

সুমনা বললো— দূর জানলাম আর কোথায়? একটা দুটো সেমেস্টার করেছিলাম বাস!

— বাঃ, ছাড়লে কেন?

— আমার চাকরির খুব দরকার ছিল। চাকরিটা পেয়ে গেলাম।

— চাকরি? হায় ভগবান! তোমার চাকরির দরকার হ্ল!

সুমনা বললো— সরিৎদা, তুমি তোমার বন্ধুকে বলো নি আমি অরফ্যান, কনভেন্টে মানুষ!

সরিৎ ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বললো— কী যে বলো সুমনা। আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার প্রাইভেট ব্যাপার নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাবো কেন?

— কী ব্যাপার? আমি জানতে পারি? রঞ্জন বিয়ারে চুমুক দিয়ে বললো।

সুমনা তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা হালকা করে নিতে হেসে বললে— হ্যাঁ আপনি জানতে পারেন পেতে পারেন।

রঞ্জনও হেসে ফেললো— 'মে আই' ফর্মটা পাঁচ-ছ বছরের অভ্যেস তো! ইংরেজরা এইসা ঘুরিয়ে নাক দেখানো জাত! অভ্যেসটা ছাড়লেও ছাড়তে চায় না, তো?

সুমনা বললো— তো আর কি? বাবা-মা না থাকলে কী হবে, মাদার ছিলেন?

— কে! মাদার টেরিজা নাকি!

সুমনা সরিৎ দুজনেই হেসে উঠলো। সুমনা বললো— মাদার টেরিজা ছাড়াও মাদার আছেন রঞ্জনদা। আমাদের মাদার সুপিরিয়র ছিলেন বীথিকা ভেরোনিকা। উনি, তাছাড়াও সিস্টাররা ছিলেন এঁদের সবার ভালোবাসায় বড় হয়ে উঠেছি। না...আসলে মা বলতে আমি ওইরকমই বুঝি। অন্যরকম মানে লালপাড় শাড়ি-টাড়ি সিঁদুর টিপ পরা মা...আমি জানি না।

সে তার ড্রিঙ্কের গ্লাসটা তুলে নিলো। সরিৎ আর রঞ্জন চোখ চাওয়া-চাওয়ি

করলো। যতই বাস্তববাদী, সপ্রতিভ মেয়ে হোক এই জায়গাটা সুমনার দুর্বল জায়গা। সরিৎ আগে কখনও সুমনাকে এই নিয়ে এতটা বিচলিত হতে দেখেনি। বাবা মা ভাই বোন এগুলো সব রহস্য রোমাঞ্চময় সম্পর্ক সুমনার কাছে। এগুলোর জন্যে ওর ভেতরে একটা আকাঙ্ক্ষা কাজ করে যায়। সেটা আজ যতটা প্রকাশ পেলো আগে কখনও এতটা হয় নি। অথচ এই স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্কগুলো যাদের আছে, তারা অনেকেই বীতশ্রদ্ধ। রঞ্জনই তার একটা উদাহরণ। মা-বাবা না থাকুন। পরিবার যাকে বলে, পারিবারিক শিক্ষা, ভালোবাসা, আদর যাকে বলে, তার চূড়ান্ত তো ও পেয়েছে। অথচ যিনি সব দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকেই ও পালাতে চাইছে। সে নিজেও মা-বাবা না হোক দাদা, ভাই, এই সম্পর্কগুলো থেকে ইতিবাচক তো কিছু পেলো না!

৪

এটা উপক্রমণিকা। সুমনার সঙ্গে রঞ্জনের আলাপের। কাজের সময়ে, বিশ্রামের সময়ে যখন-তখন তার সেলফোনে রঞ্জননারায়ণ মুখার্জির অর্গ্যান গলা ভেসে ওঠে।

— সুমনা। হাউ আর য়ু?

— এই তো কালই ফোন করলেন। ভালো আছি বললাম তো!

— তুমি কি বিরক্ত হচ্ছো?

— না না। বিরক্ত হবো কেন?

— আসলে কী জানো, সব সময়ে তোমার কথা মনে পড়ছে। সামহাউ আই কান্ট ফরগেট ইয়োর ফেস।

— ভোলবার দরকার কি? রেখে দিন না। সুমনা হাসলো।

— আজ বিকেলে সময় হবে?...

— কেন?

— প্লিজ। সুমনা, আজ সন্ধেয় একটু এসো কাজ আছে।

— থাক কাজ, প্লিজ।

অতএব কোনদিন স্বভূমিতে, কোনদিন নল বনে সন্ধে নামে। সন্ধে নামে প্রিন্সেপ ঘাটে। দূরে স্টীমারের ভোঁ। দুজনেই উন্মনা। আস্তে আস্তে হাঁটছে। হ্যালো বলবার পর থেকে কেন কে জানে সুমনা আজ কোনও কথা খুঁজে পায়নি। ভেতর থেকে একটা চাপা টেনশন তাকে স্তব্ধ রেখেছে।

রঞ্জন প্রায় আত্মগত বললো— সো য়ু আর আ ক্রিশ্চান!

সুমনা চমকে বললো— কিছু বললেন রঞ্জনদা?

রঞ্জন বুকে ক্রস করে বললো— আমেন।

একটা বেঞ্চে বসলো রঞ্জন।

সুমনা বললো— হঠাৎ ক্রস করলেন? আমেন, কেন?

রঞ্জন হঠাৎ হেসে কিছু একটা ভাবনা যেন ঝেড়ে ফেলে দিল, বললো— না ভাবছিলাম শ্রীমতী সুমনা তুমি তাহলে ক্রিশ্চান?

— অবভিয়াস। জন্মের আগেই বাবা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। মা আমাকে জন্ম দেওয়ার দু তিন দিন পরেই মারা গেলেন। উনি নিজে মাদারের হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিলেন। ওঁরাই বড় করেছেন। ওঁরাই ব্যাপ্টাইজ করেছেন, ওঁদের নিয়ম।

রঞ্জন একটু ইতস্তত করে বললো— তুমি কি খুব গোঁড়া?

সুমনা বললো— গোঁড়া? কই না তো! তবে আমার প্রেয়ার, ম্যাস, গ্রেস, যীশু,

মা মেরি, চার্চ, চার্চ বেল— সব খুব ভালো লাগে। সব।

রঞ্জন শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বললো— তোমার সঙ্গে আমার কী আশ্চর্য মিল! এতটা যে আমি শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার বাবা-মা দুজনেই একই অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। তুমিও যেমন মা নয়, একজন মাদারের কাছে মানুষ হয়েছো আমিও তেমনি। তবে তোমার মাদার সুপিরিয়র, হেসে যোগ করলো, আমার মাদার ইনফিরিয়র এই যা।

সুমনা বললো— ধ্যাৎ এরকম আবার কেউ বলে না কি! ছিঃ— দুজনেই হেসে ফেলে।

রঞ্জন বললো— ঠাট্টা না। সত্যি। এইজন্যে আমাকে আজও কেউ বুঝলো না। উনি আমাকে দারুণ ভালোবাসেন। অন্যদের পড়াশোনা শেষ হতেই কোনও না কোনও ব্যবসায় বসিয়ে দিয়েছেন। আমাকে কাছাকাছি রাখতে চান। কোনও কাজ করতে দেবেন না। কাছছাড়া হতে দেবেন না। জাস্ট থিংক অব ইট! শি ইজ আ উইচ!

— এমা, এরকমভাবে বলবেন না রঞ্জনদা প্লিজ।

— আরে আমারই কি ভালো লাগে বলতে! আফট্রল উনি আমার মা, ঠাকুমা, দিদিমা সব। যা চেয়েছি দিয়েছেন। যা বলেছি মেনেছেন। ইংল্যান্ডে পাঠালেন গ্র্যাজুয়েশন করলাম লন্ডন ইউ থেকে, কিন্তু ব্যারিস্টারি আমার ভালোই লাগছিল না। কে অত ল-এর কচকচি মনে রাখে। বোঝোই তো সিরিয়াস লেখাপড়া আমার ধাতে নেই। আমি খেলা পাগল ছিলাম। আমার কোচ তখন আমার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা দেখছেন, উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। এলাম। ব্যাস আর যেতে দিলেন না। সুমনা ডোন্ট গেট মি রং। আই ডু লাভ হার। বাট, দিস ইজ টু মাচ!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো। ব্যক্তিগত সমস্যা একজন প্রায় অপরিচিত ব্যক্তির। সমস্যার চাপটা বেশি বলেই কি ও এত সঙ্গ খুঁজছে? কে জানে! হতে পারে! কতটুকু মেলামেশা করেছে সে মানুষের সঙ্গে! কিছু বলা উচিত কি উচিত নয় তাই সুমনা বুঝতে পারে না।

— ভাবতে পারো? রঞ্জন বলে উঠলো— থিয়েটার রোডে আমাদের একটি ফ্ল্যাট আছে, সেটার চাবি পর্যন্ত এবার উনি আমাকে দিলেন না।

— এখানে কোথায় থাকেন? সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলো সুমনা।

— হোটেলে। স্রেফ হোটেলে। একটা চাকরি জোটাবার চেষ্টা করছি। আইল্যান্ডে আমি আর ফিরবো না।

— আইল্যান্ড?

রঞ্জন বললো— হ্যাঁ। সরিৎ তোমায় বলেনি?

— কী বলবে? আপনার কথা খামোখা আমাকে...

রঞ্জন অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো— আরে খামোখার কি আছে। সবাই জানে

আমার ঠাকুমা রাজেশ্বরী দেবীর একখানা গোটা আইল্যান্ড আছে সুন্দরবনে। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন মিলিটারিতে মেজর। ফার্স্ট কাশ্মীর যুদ্ধে মারা যান। ঠাকুমা বেশিরভাগই থাকতেন ভোপালে। ওঁর বাবা ফ্যাবুলাসলি রিচ। তাঁর একমাত্র মেয়ে। বোঝো কীরকম স্পয়েলট! এনিওয়ে আমার বাবাকে উনি দুন স্কুলে রেখে মানুষ করেছিলেন। হি ওয়জ আর্মি ডক্টর। আমরা চার ভাই জন্মালাম। আমার ছোট ভাই যখন বছর তিন, আমি পাঁচ তখন মাত্রই হিমাচলপ্রদেশ থেকে দিল্লিতে ফেরবার পথে এয়ারক্র্যাশে আমার মা বাবা দুজনেই শেষ। তখন থেকেই উনি আর লোকালয়ে থাকতে পারলেন না। সুন্দরবনে একটা দ্বীপ ছিল ওঁদের। সেটাকেই ডেভলপ করলেন। নিজস্ব লঞ্চ সিসটেম। সব কিছু। নির্জনবাস শুরু হল।

— ইশ্‌শ! সুমনার কষ্ট হতে লাগল ছেলেটির জন্যে।— আপনার মনে আছে ওঁদের? সে বলল।

রঞ্জন দূরের দিকে তাকিয়ে বললো— স্লাইট।

— তারপর?

— আমার বড়দা প্রদীপকেই প্রথম স্কুলবোর্ডিং-এ পাঠালেন ঠাকুমা। তারপর একে একে আমাদের সবাইকে...ছুটিতে আমরা দ্বীপে যেতাম। খুব হুটোপাটি, মজা হুল্লোড়... বাই দা ওয়ে ওই দ্বীপটার নাম শাকম্ভরীর দ্বীপ।

সুমনা হঠাৎ কেমন শিউরে উঠলো। বললো— অদ্ভুত নাম তো! শাকম্ভরীর দ্বীপ!

রঞ্জন হেসে বললো— আসলে ওখানে শাকম্ভরী দেবীর একটা মন্দির ছিল। তাই থেকেই নাম।

— শাকম্ভরী কী দেবী? কখনও শুনিনি তো!

— আমিই কি অত জানি। বোধহয় দুর্গার অন্য একটা নাম। মন্দিরটা আধভাঙা, বনজঙ্গল। মূর্তিটাও হাতভাঙা...ওইখানে আমি বাঘের ছানা নিয়ে খেলা করতাম।

— বাঘের ছানা? সুমনা চমকে বললো।

— আরে অত চমকাবার কী আছে? আমি তো বাঘ পুষতাম। একটু বড় হলে লঞ্চে করে জঙ্গলে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসতাম।

— বাপ রে! সাঙ্ঘাতিক! ওখানে কারা থাকে?

— কেউ না মাদমোয়াজেল। খালি রাজেশ্বরী দেবী। তাঁর ম্যানশন, এবং তাঁর লোকজন। বেশির ভাগটাই জঙ্গল। বিউটিফুল। খুব সাবধানে জঙ্গুলে লুকটা মেনটেন করেন উনি। বাঘ নেই, তবে সাঁতরে চলে আসতেও পারে। আর কুমীর মাঝে মাঝেই পাড়ে শুয়ে রোদ পোয়ায়।

— রোদ পোয়ায়! কখনও মানুষ মারে না!

— মারে বই কি! সুযোগ পেলেই মারে। একবার আমাদের এক স্টাফকে ঠ্যাং

ধরে নিয়ে একেবারে মাঝনদীতে...। তখন আমি ছোট।

— কী কাণ্ড। ওই ভয়ানক জায়গায় থাকতে ভয় করে না আপনাদের? ওঁর?

— শী ইজ আ টাইগ্রেস, তা যদি বলো। ভয় ডর নেই।

— আর আপনার?

রঞ্জন হঠাৎ জোরে হেসে উঠলো।

— কী হল হাসছেন?

— হাসবো না? তুমি আমাকে এই চিনলে? বললাম না বাঘের ছানা নিয়ে খেলা করতাম! রঞ্জন মুখার্জি ভয় কাকে বলে জানে না। ডিকশনারিতে নেই। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? তোমাকে তো খুব ভিতু ভিতু মনে হয় না?

সুমনা বললো— একটু ভাবতে হবে।

— ভাবো, ভেবে বলো। আমি অপেক্ষা করছি।

কিছুক্ষণ পর সুমনা ভেবেচিন্তে বললো— ভূতের ভয় নেই। জীবনে বিপদ-আপদ সংকট এলে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই রঞ্জনদা। কেন বলুন তো!

রঞ্জন বললো— কেন!

— কেন না হারাবার কিছু নেই। আর বাঘ? বাঘ-টাঘ সামনে দেখলে কী করবো আমি সত্যিই বলতে পারবো না। টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট। অত সুন্দর একটা জীব, অথচ ভয়ানকও তো!

— সুন্দরবনের বাঘ ভয়ানক ধূর্তও সুমনা। বুদ্ধিতে ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা খুব শক্ত। তুমি নিশ্চিন্তে পথ চলেছো ধরো, ভাবছো এখানে আশে পাশে বাঘ নেই, মোটের ওপর খোলা জায়গা, নদীর ধার। কোথাও কোনও বাঘের পায়ের দাগ নেই। হঠাৎ তোমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লো, টুঁটি টিপে শেষ করে নিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরে। তারপর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে— রঞ্জন পুরো জিনিসটা অভিনয় করে দেখালো।

সুমনা শিউরে উঠে বললো— বাবা! আপনি এমন করে বলছেন!

রঞ্জন হেসে বললো— আচ্ছা ঠিক আছে। অনেক ভয় দেখিয়েছি। চলো এক জায়গায় নিয়ে যাই। লেটস এনজয় লাইফ।

বাইরে রঞ্জনের মোটর বাইক পার্ক করা রয়েছে। ও একলাফে চড়ে বসলো। সুমনা পেছনে বসলো সন্তর্পণে।— কোথায় যাচ্ছি আমরা?

— দেখা যাক।

বাইকের গতি দারুণ উপভোগ করে সুমনা। কোথায় যাচ্ছে রঞ্জননারায়ণ সে জানে না। যদি কোথাও না গিয়ে শুধু এইরকম চলা যেত কোনও ফাঁকা রাস্তায়। তাহলে বোধহয় আরও ভালো লাগতো। টাকা জমিয়ে সে-ও একটা বাইক কিনে ফেলবে। দারুণ। এহ্, টাকা জমলে তো ট্রেনিং নেওয়ার কথা, কোনটা আগে করবে! অবশ্যই ট্রেনিংটা আগে। নইলে শুধু অভিজ্ঞতার জোরে আর কত দূর যাওয়া যায়!

বেশি দূর না। বাইকটা পার্কস্ট্রিটেরই একটা হোটেলে এসে দাঁড়ালো। সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে নাইটক্লাবে ঢুকলো রঞ্জন। মৃদু আলো। ঘরে ঢুকতেই মিউজিক, তার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের গুঞ্জন কানের ওপর আছড়ে পড়লো। কোণের দিকে একটা জায়গা বেছে দুজনে বসলো। একটু পরে রঞ্জন বললো— কীরকম লাগছে?

সুমনা প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে বললো— আমি কখনও আসিনি। আপনি কি প্রায়ই আসেন?

— ওহ্ নো। অ্যাকচুয়ালি আমি কিছুদিন খুব ডিসটার্বড...

— ডিসকোয় শান্তি পান?

রঞ্জন বললো— কেন আপত্তি আছে?

সুমনা সাবধানে বললো— না জাস্ট ভাবছিলাম...

রঞ্জন বললো— শব্দ আছে, লটস অ্যান্ড লটস অব সাউন্ড, দৃশ্য আছে লটস অ্যান্ড লটস অব সাইটস।... ভাবনা চিন্তাগুলো ডুবে যায়।

সুমনা এবার হেসে বললো— আপনার কেস খুব খারাপ রঞ্জনদা। আপনার ভেতরে শেকড় গেড়ে বসে আছে আপনার ওই শাকম্ভরীর দ্বীপ, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। আর ম্যানশনের মধ্যে আপনার ঠাকুমা, যিনি মা-ঠাকুমা-দিদিমা সব। একবার অন্তত ওখান থেকে ঘুরে আসুন। আমার খালি মনে হচ্ছে খুব দামী কিছু, আপনার জীবনের কেন্দ্রীয় কিছু ওখানে রয়ে গেছে।

রঞ্জন হাত বাড়িয়ে সুমনার হাতে রাখলো... শিউরে উঠলো সুমনা।

— সো সুমন, তুমি বুঝতে পারছো? ইউ ফীল দ্যাট! না?

সুমনা মৃদু হেসে তাকিয়ে রইলো। তার হাসি ঈষৎ লাল।

— য়ু আর আ ন্যাচার‍্যাল ফ্রেন্ড। ভেরি ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড গ্রেশাস!— রঞ্জনের চোখ দুটো এখন খুব নরম হয়ে এসেছে।

রঞ্জনের সামনে চিলড্ বিয়ার, সুমনার সামনে শাদা পানীয়। বিয়ারটা শেষ করে রঞ্জন হঠাৎ বললো— সুমন প্লিজ, এসো নাচি।

— আমি পারি না রঞ্জনদা।

— আরে এখানে তো তোমাকে কোনও বল ডান্স করতে হচ্ছে না। জাস্ট মিউজিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাবে। তুমি একটা স্পোর্টসওম্যান। ফ্লেক্সিব্‌ল্ বডি। আপনা থেকে হয়ে যাবে।

সুমনা সেভাবে কখনও নাচে নি। কিন্তু সত্যিই খেলা শরীরে একটা ছন্দ এনে দেয়। কোনও কিছু নিয়েই তার বেশি না-না করতে ইচ্ছে করে না। পুরো জীবনটা, এই শহর ভর্তি মানুষ, তাদের অতীত, উৎস, সবই তার অজানা। সঙ্গের রঞ্জননারায়ণ নামে ব্যক্তিটিও অজানা। কিন্তু বিস্ময়! দারুণ চিত্তাকর্ষক! সে হাসিমুখে নাচতে উঠে যায়। বাজনার তালে তালে একেবারে মুক্তছন্দে বা বলা উচিত মুক্তমুদ্রায় নাচতে সত্যি কথা

বলতে কি তার আশ্চর্য ভালো লাগে। যেন সে এই প্রথম কোনও পরমকাম্য মুক্তির স্বাদ পেলো। আপনাতে আপনি পূর্ণ হবার স্বাদ। কোনরকম জড়তা ছাড়া, আত্মসচেতনতার অতীত এই বিচরণ তাকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। সেখানে মাদার বা সিস্টারদের আদেশ বা মমতা কাজ করছে না। সেখানে পেশাদার জীবনের ইতিকর্তব্যের কোনও প্রতিফলন নেই। তার যে পশ্চাৎপট, অনাথ পিতৃমাতৃহীন আত্মীয়হীন অবস্থা সেই ব্যাপারটাই সে ক্রমশ ক্রমশ ভুলে গেল। এ যেন এক বিচিত্র ছন্দোময় জগৎ। এই ছন্দে আশার অতিরিক্ত মুক্তি আছে।

রঞ্জন যেন কেমন একটা অদ্ভুত কৌতূহলের চোখে তাকে দেখছিল। দুটো তিনটে মিউজিক বদলে গেল, তখনও সুমনা বিভোর হয়ে নেচে যাচ্ছে। রঞ্জন বললো— সো য়ু আর এনজয়িং ইট, আরন'ট য়ু?

সুমনা বিভল মুখে মাথা নাড়ে। তারপর দুজনে আবার এসে বসে।

— ওয়ান্ডারফুল! রঞ্জন বলে মুগ্ধ হয়ে— য়ু আর আ নাচার‍্যাল ডান্সার।

— তাই? চকচকে মুখে সুমনা বলে।

— ইয়েস। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো সব ভুলতে আমি কেন এখানে চলে আসি।

ওরা যখন বেরিয়ে এলো রাত বারোটা বাজছে। গলির মোড়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে রঞ্জনের বাইক চলে গেল। চাবি ঘুরিয়ে নিজের স্যুইটের দরজা খুললো সুমনা। হঠাৎ যেন সে বাস্তবে ফিরে এসেছে। মিসেস রডরিগস আবার খেয়াল রেখেছেন নাকি? কৈফিয়তের সামনে পড়তে হবে? আশ্চর্য, একটুও অপরাধবোধ নেই মনে। সে যেন পাখির ডানায় ভর করে উড়ছে। এরকম অনুভূতি তার আগে কখনও হয়নি।

আমি কি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি? সবটাই কেমন অবাস্তব! রঞ্জননারায়ণ অবাস্তব, তার সঙ্গে জড়িত সব কিছুই অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর এবং অবাস্তব। বারবারা কার্টল্যান্ড যে রকম রূপকথার রাজপুত্তুর আঁকেন সেইরকম।

ঘোরের মধ্যেই জামাকাপড় বদলালো সে। মুখটুখ ধুলো। এত রাতে আর চান করতে ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়াও তার সমস্ত শরীরে যেন মায়া, সুগন্ধ, স্বপ্নের হালকা ছোঁয়া লেগে রয়েছে। জল দিলে বুঝি সেসব ধুয়ে মুছে সাফসুতরো দৈনন্দিনের সুমনা বেরিয়ে পড়বে। সুমনা মেরিল মণ্ডল— বাবা-মা আত্মীয় স্বজনহীন একটা একলা মেয়ে বিরাট পৃথিবীতে যে পায়ের তলার মাটি খুঁজতে বেরিয়েছে। বাইরের রাস্তায় আলো পড়েছে কুণ্ডলী পাকানো দুটো কুকুরের ওপর। সামনের বাড়ির শেষ আলোটা নিবে গেল। বিছানায় আসে সে আস্তে। হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে শুয়ে পড়ে— কে যেন কানে কানে বলে— য়ু আর আ ন্যাচার‍্যাল ফ্রেন্ড...য়ু আর আ ন্যাচার‍্যাল ডান্সার। অন্ধকারে তার চোখ চিকচিক করে। এই তেইশ বছরের জীবনে সে কিছু কিছু প্রশংসাবাক্য শুনেছে ঠিকই। অনেকটাই তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলা কিন্তু শ্রেষ্ঠ

কমপ্লিমেন্ট যদি সে কিছু পেয়ে থাকে সে হল ওই ন্যাচার‍্যাল ফ্রেন্ড, ন্যাচার‍্যাল ডাক্তার।... একটা সবুজাভ আলোর সমুদ্রে সে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে।

আলোটা যেন আলো নয়, একটা হাতছানি। কে তাকে নিশির ডাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে গভীর সবুজের মধ্যে। এটা কোন দেশ! সে এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে। একটা ভাঙা মন্দির। দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে। শব্দটা সে শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু বুঝতে পারছে। দরজাটা খুলবে? ভালো করে? ওর ভেতরে একটা মূর্তি আছে। ভাঙা। সে শুনেছে। দরজাটা তাকে খুলতে হবে। হাত ঠেকিয়েছে কি না ঠেকিয়েছে ভেতর থেকে একটা ক্রুদ্ধ হুংকার। লাফিয়ে বেরিয়ে এলো একটা বাঘ, গর্জনের পর গর্জনে ভরে যাচ্ছে চারদিক। চিৎকার করে উঠে বসলো সুমনা। ঘামে ভিজে জবজব করছে সে। দূর থেকে অ্যালসেশিয়ানের ডাক ভেসে আসছে। ছাবরিয়াদের দুটো অ্যালসেশিয়ান আছে। ক্রস করলো সুমনা। বুকের ধকধকানি থামছে না। ওহ্, উহ্হ্হ্! কী ভয়ানক স্বপ্ন। কী ভয়ানক!

৫

মনটা কদিন খুব খুশি-খুশি রঞ্জনের। সরিতেরও। রঞ্জন একটা ভালো এগজিকিউটিভ পদে চাকরি পেয়েছে। পি.আর.ও. একটা ভালো কম্প্যানিতে। সরিৎ কাজটা পেতে সাহায্য করতে পেরেছে বলে তার মন খুশি। রঞ্জনের চাবুকের মতো চেহারা, ফোয়ারার মতো অনর্গল কথাবার্তা। লন্ডন য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রি, স্পোর্টস কেরিয়ার, বংশমর্যাদা! কিছু নয় শুধু জায়গা মতো বসিয়ে দেওয়া। এইরকম পাঁচ সাতটা চাকরি এক্ষুনি পেতে পারে ও। যদি লেগে থাকে স্কাই ইজ দা লিমিট। এটা সরিতের ভাবনা। সেই সঙ্গে সংশয়। আদৌ কি মন বসাতে পারবে রঞ্জন! মাস তিনেক হয়ে গেছে। রঞ্জন সুখী আপাতত।

দিনের শেষে বাড়ি ফিরছে রঞ্জন। তৃতীয় মাসের মাইনে কড়কড়ে নোটগুলো ওয়ালেটে। ব্যাংক থেকে সামান্যই তুলেছে অবশ্য। কে আজকাল কাঁচা টাকায় দেওয়া-নেওয়া করে। দুটো ক্রেডিট কার্ড। এ.টি.এম.। ভাবনা কী? তার উত্তরাধিকারে প্রাপ্তব্য হাতখরচের চেয়ে খুব কম নয় অঙ্কটা। তবে হ্যাঁ এর চেয়ে বেশি চাইলে রানী রাজেশ্বরী দিয়ে দিতেন। বোকা কোম্পানিটা দিতে চাইলো না। টু ব্যাড।

বাইকটা গারাজ করলো। দুতিন লাফে উঠে গেল হোটেলের লাউঞ্জে। এটা একটা মধ্যম মানের হোটেল। বহু লজার অল্প কিছুদিনের জন্য এ শহরে থাকতে হলে এটাকে ঠিকানা করে। কাউন্টার থেকে চাবি নিয়ে তর্জনীতে একবার ঘুরিয়ে নিলো সে। রিসেপশানের ছেলেটি বললো— স্যার, আপনার একটা চিঠি আছে।

— চিঠি? আমার? রঞ্জন একটু অবাক।

— এই যে,— ছেলেটি বড় একটা আয়তাকার খাম এগিয়ে দিল। মোটা বালি রঙের খাম, যে রকম পার্সেলের জন্য ব্যবহার করে। ভেতরে ভারী কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। খামটা লুফতে লুফতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলো রঞ্জন। শিস দিতে দিতে ঘরের চাবি ঘোরালো। ঢুকে এ.সি. চালিয়ে দিল, আলো জ্বেলে দিল। চাবিটা বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিল। সোফায় বসলো. সামনের টেবিলে চিঠিটা রাখলো। জুতো টাই খুলতে খুলতে গজগজ করতে লাগলো— জাঙ্ক মেল আর কী! ম্যাগাজিন-ফ্যাগাজিন। নিত্য নতুন উঠছে। বিজনেস ম্যাগাজিনের সাইজ আরেকটু ছোট হয় অবশ্য। কে জানে কী!

জুতোটা গুছিয়ে রাখলো। টাইটা টাঙালো। কিন্তু শার্টটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। —ড্যামিট। কী গরম সারাদিন!— শুধু প্যান্ট পরে কিছুক্ষণ একটা রিক্লাইনিং চেয়ারে চোখ বুজিয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

হঠাৎ বিরক্ত স্বরে বলে উঠলো— বক বক বক। বকতেও পারে বটে!

উঠে বাথরুম গেল। শর্টস পরে ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরে। দরজায় টোকা। চেঁচিয়ে বললো— কাম ইন।

বেয়ারা ঢুকলো। ট্রেভর্তি খাবার, টিপট সব সোফার সামনের টেবিলে রেখে গেল। আস্তে আস্তে এসে বসলো রঞ্জন। চা ঢেলে চুমুক দিল, একটা প্যাটিস জাতীয় কিছুতে কামড় দিল আনমনে।-- ওহ্ দ্যাট জাঙ্ক মেল!

খামটা তুলে নিয়ে একটু চেষ্টা করে ওপরের সেলোটেপ খুলে ফেলে খামটা খুললো, ভেতরে আর একটা বড় খাম, গাঢ় রক্তের মতো লাল, যাকে বলে খুন খারাপি রং। তাতে সোনালি মনোগ্রাম।

আরে কী ব্যাপার! বুড়ি তাহলে এবার বুঝেছে!— উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে। ডাকো! ডাকো মা রাজরাজেশ্বরী, ইগো ত্যাগ করে রঞ্জননারায়ণের পায়ে পড়ো। না হলে যাচ্ছি না। নো ওয়ে।

খামের ভেতরে একটা কার্ড। শুভবিবাহ লেখা। পড়ছে ছেড়ে ছেড়ে।

২৫এ ফাল্গুন গোধূলি লগ্নে...প্রয়াত ক্যাপটেন সুরজলাল ভাটিয়ার কন্যা কল্যাণীয়া তেজস্বিনীর সঙ্গে...আমার পুত্র স্বর্গত প্রভাসরঞ্জনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সৌভিক নারায়ণের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো রঞ্জন চিঠিটার দিকে। তারপর সামনের খাবারের ট্রেতে একটা লাথি মারলো। ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। বাঁ হাতের ওপর ডান হাত দিয়ে ঘুঁষি মেরে গর্জন করতে লাগলো— ড্যাম ইট। ড্যাম দ্যাট ওল্ড হ্যাগ।

মুখটা তার ছেলেমানুষি চেহারা ছেড়ে অতি ভয়ংকর দেখাচ্ছে এখন। মোবাইল ফের বার করলো। ওহ্ দ্যাট গডফরসেকন ল্যান্ড কানট বি রীচড্। আবার ফোনে একটা নম্বর টিপলো। ওদিক থেকে সাড়া এলো— হ্যালো!

রঞ্জন বললো— সরিৎ শিগগির একবার আসতে পারবে?

— আরে আমার ডিউটি শেষ হতে আরও এক ঘণ্টা।

রঞ্জন চাপা গর্জন করে উঠলো— ড্যামিট। ওসব আমি শুনতে চাই না। এক্ষুনি এসো। দিস মিনিট। কোনও অজুহাত নয়। ইট ইজ অ্যাজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ হেল।

ফোন অফ করে বসে পড়লো সোফায়। পা দিয়ে বাকি যা টেবিলে ছিল ফেলে দিল এক ঝটকায়। পা একটু কেটে রক্ত ফুটে উঠলো। গ্রাহ্যও করলো না। মুখের চেহারা বাঘের মতো। মাথার চুলগুলো ঝাঁকালো, তারপর দুহাতে চুল আঁকড়ে বসে রইলো।

সরিতের কর্মক্ষেত্র থেকে এই হোটেল বেশি দূরে নয়। কিন্তু ঝড় উঠছে। মিনিট কুড়ি লাগলো তার পৌঁছতে। কী ব্যাপার? এইরকম তাড়া! ফোনের মধ্যে দিয়ে যতটা ক্রোধ ততটাই বিপন্নতা টের পাওয়া যাচ্ছিল। চাকরি স্থলে কিছু হল না কি? চিরদিনই মেজাজি, খেয়ালি রঞ্জন। কিন্তু কতটা পরিবর্তন তার হয়েছে সে জানে না। সত্যি কথা

বলতে কি এখন মনে হচ্ছে ওর জন্য কোথাও সুপারিশ করাও ঝুঁকির কাজ। সে জানে কতটা দায়িত্ববোধ ওর। কারুর অধীনে কাজ করার মনোবৃত্তিই ওর নেই। ক্ষমতাটা বড় কথা নয়। মিলিটারি মেজাজ, জমিদারি মেজাজ। রঞ্জন নিজেও জানে না সে কতটা অনুপযুক্ত যে কোনও চাকরির। শুধু তার মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে। এখন কী শুনতে হবে কে জানে! কিন্তু সে সরিৎ, কর্তব্য বা দায়িত্ব এড়ানোর ছেলে নয়। কমিটমেন্ট জিনিসটা তার মজ্জাগত। সে পরিবারের প্রতিই হোক, বন্ধুর প্রতিই হোক। রঞ্জনের ঘরের নম্বর সে জানে, রিসেপশনের লোকেরা তাকে চিনে হাসলো। সরিৎ ওপরে উঠে গেল। দরজায় নক করতে, ভেতর থেকে একটা চাপা হুংকার ভেসে এলো— কাম ইন, না হালুম বোঝা দায়। সরিতের হাসি পেয়ে গেল। কী মনে করে ছেলেটা? ওর এই হালুম-হুলুম সর্বত্র চলবে। বুদ্ধুমির একটা সীমা আছে। দরজা খুলেই সরিৎ আঁতকে উঠলো।

চতুর্দিকে ভাঙা পেয়ালা পিরিচ। টি পটের ভাঙ্গা নলটা বড় সড় একটা শামুকের মতো সামনে পড়ে বসেছে। সেই সঙ্গে থ্যাঁতলানো, ভাঙা খাবার, রক্ত।

এ কী! ব্যাপার কী রঞ্জন! এত কাঁচ ভাঙলো কে? পা-টা কেটে গেছে যে! ইশশ্ বেশ রক্ত পড়ছে...

উত্তরে রঞ্জন শুধু উচ্চারণের অযোগ্য একটা চার অক্ষরের ইংরেজি অশ্লীলতা উচ্চারণ করলো, টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললো— ড্যাম, ড্যাম ইট।

সরিৎ সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুললো, নির্দেশ দিল। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বসবার জায়গা বলতে খাট। সে এগিয়ে গিয়ে খাটের ওপর কিছু পড়েছে কিনা দেখলো। একটু পরেই অবশ্য হোটেলের স্টাফ ঢুকলো, নিঃশব্দে ঘর পরিষ্কার করে চলে গেল। আরও একজন ঢুকলো হাতে একটা ফার্স্ট এড বক্স। পায়ের কাটা জায়গাটা মুছে, ওষুধ লাগিয়ে একটা স্ট্রিপ লাগিয়ে দিল। চলে গেল। রঞ্জন চিৎকার করে বললো— হুইস্কি অন দা রকস্। অ্যান্ড স্টপ দ্যাট ড্যাম্‌ড্ এ.সি.। আই ফীল সিক।

সরিৎ এগিয়ে গিয়ে এ.সি.টা বন্ধ করে দিল। তার ইঙ্গিতে লোকটি পর্দা সরিয়ে জানলা খুলে দিল।

বাইরের প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়লো। সব ওলটপালট করে দিচ্ছে। সরিৎ জানলাটা বন্ধ করতে গেল। রঞ্জন বলে উঠলো— থাক। এবার সরিৎ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো— কী হল রঞ্জন? কী হয়েছে?— লাল চোখে শুধু একবার তাকালো রঞ্জন। হুইস্কি এসেছে। সামনে লম্বা গ্লাসে বরফ দিয়ে ঢেলে ঠিকঠাক করে দিল বেয়ারা। আইস বাস্কেট আর বোতল রেখে চলে গেল। এক চুমুকে গ্লাস খালি করে দিল রঞ্জন। চিঠিটা মাটিতে পড়ে আছে সোফার গা ঘেঁষে, আঙুল দিয়ে শুধু দেখালো সেটাকে। সরিৎ চিঠিঠা তুলে পড়লো। বললো— ভালো খবর তো। তোমার মেজদার বিয়ে হয়েছে আজ নাইনটিস্থ মার্চ মানে কদিন আগেই...তো কী। দেরি

হয়ে গেছে, উৎসবে যোগ দিতে পারো নি? ঠিক আছে, এখন যাও ঘুরে এসো, দাদাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে...

কথা শেষ করতে দিল না রঞ্জন। বিকৃত গলায় বলে উঠল— আই'ল কিল দ্যাট রাস্কেল।

— কী ব্যাপার বলো তো? সরিতের স্বরে বিরক্তি গোপন নেই।

— ক্যান য়ু ইম্যাজিন ইট! আমার ছোটবেলাকার বন্ধু জিনির সঙ্গে বুড়ি সৌভিকের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

সরিৎ চুপ করে গেল। একটু পরে ইতস্তত করে বললো— এই তেজস্বিনীই সেই মানে যাকে তুমি...

রঞ্জন উদ্ধত গলায় বললো— হ্যাঁ, ইয়েস, রিজেক্ট করেছিলাম। ইচ্ছে হয়েছিল করেছিলাম। পানিশমেন্ট। আমার ওপর মেজাজ দেখায় এত বড় সাহস...! তার মানেই বুড়ি তার সঙ্গে সৌভিকের...ওহ্ গড।

দু হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে রঞ্জন। সামনে সরিৎ চুপ। বৃষ্টি শুরু হল। ঠং ঠং আওয়াজ হচ্ছে। সরিৎ বললো— শিলাবৃষ্টি নাকি! সে উঠে জানলার কাছে যায়। রঞ্জন তীব্র গলায় বলে উঠলো— সরিৎ জানলা থাক। ইটস আ হেইল স্টর্ম অলরাইট, লেট ইট ডেসট্রয় এভরি ড্যামড্ থিং...।

একটু পরে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। জানলার ধারে সরিতের কাছে চলে যায়। বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে দুজনেই, সরিৎ সরে এলো। বসলো সোফায়। রঞ্জন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পেছন ফিরলো, বিদ্রূপের স্বরে বললো— তোমার সেই ঝুড়ি? প্রশ্নের ঝুড়ি নাবাবে না? কেন? কী? কেমন? কেন...কেন...কেন...।

সরিৎ শান্তভাবে বললো— এখন রাগারাগি করে তো লাভ নেই। হঠকারিতা করেছো। তার ফল। কাম ইয়োরসেল্‌ফ প্লিজ— আমি চললাম।

সে চলে গেল। দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। ঠাস করে। সরিৎ বিরক্ত হয়েছে।

রঞ্জন কিন্তু নিজেকে শান্ত করতে পারলো না। সেই যে ঘরে দু তিনটে হুইস্কির বোতল আনিয়ে নেয়, ব্যাস আর বেরোয় না, অফিস টফিস সব ভুলে মেরে দিয়েছে বোধহয়। তৃতীয় দিনে সরিৎ আবার এলো। সে খবর পেয়েছে রঞ্জন অফিসে আসছে না। তবে কি ও দ্বীপে চলে গেল? গেলেই ভালো করবে। যা হয়ে গেছে তা আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু রাজেশ্বরী দেবীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারে। চান্স আছে। সরিৎ মনে মনে খুবই চাইছে রঞ্জন তার নিজের জায়গায় ফিরে যাক। এই মাতঙ্গকে সামলানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। উঃ কী ভীষণ জট যে পাকিয়েছে!

রঞ্জনের হোটেলের কাউন্টারে এসে দাঁড়াতেই কিন্তু রিসেপশনিস্ট ছেলেটি বলে উঠলো— স্যার আপনি আর.এন.মুখার্জির বন্ধু না?

— হ্যাঁ কেন বলুন তো?

— উই আর ইন ট্রাবল। ভদ্রলোক কাল থেকে ক্রমাগত ড্রিংক করে যাচ্ছেন। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার কিচ্ছু খাননি। দরজা খুলছেন না। সাড়া দিচ্ছেন না। আমরা ইন্টারকমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তুলে রেখে দিচ্ছেন। কিম্বা বেজেই যাচ্ছে।

মুশকিল করলে তো! সরিৎ একটু ভাবলো, তারপর বললো— ওর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবিটা নিয়ে একটু যেতে পারি।

ছেলেটি বললো— নিশ্চয়ই। সেটাই তো আমরা চাইছি।

সরিৎ একটু এগিয়ে আবার ফিরে এলো। বললো— লুক, আই ওয়ন্ট সামবডি টু গো উইথ মি। আর ডাক্তার চাইলে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে তো?

ছেলেটি বললো— আমি কল প্লেস করে দিচ্ছি। রিসক্ নেওয়ার দরকার কী!

পার্টিশন ঠেলে সে বেরিয়ে এলো।

আধো অন্ধকার ঘরে রঞ্জন উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। চারদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো। সাবধানে এগিয়ে গেল সরিৎ।

— রঞ্জন! রঞ্জন!— উঠলো না।

— জল আনব স্যার?— রিসেপশনিস্ট বললো— জল আনতে সরিৎ জোর করে রঞ্জনকে চিত করে দিল, তারপর ক্রমাগত জলের ছিটে দিতে লাগলো মুখে।

মুখটা ঝাঁকিয়ে অল্প চোখ মেললো সে, অস্ফুটে বললো— ডোন্ট ডিসটার্ব মি য়ু বাগার।

— গেট আপ রঞ্জন, যতক্ষণ না উঠছো আমি কিন্তু ছাড়বো না। ভাই আপনি ডাক্তার এলে ইমিডিয়েটলি ওপরে নিয়ে আসুন।

রঞ্জন এবার ভালো করে চোখ মেললো— কোথায়? ওহ্ এটা কি নরক-ফরক? ওহ্ সরিৎ! আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। সে উঠে বসলো।

— কাল থেকে তো শুনছি কিছু খাওনি। ডাক্তার আসছেন।

— ওহ্ আ অ্যাম স্টার্ভিং শিগগির কিছু আনতে বলো। বাট..ডাক্তার? কেন? আই সিম্পলি হ্যাড আ ব্যাড ড্রিম। ইটস ওভার নাউ।

ডাক্তারকে নিয়ে একজন ঘরে ঢুকলো। এবং সেই মুহূর্তেই সরিতের সেল ফোনটা বাজলো।

— সরিৎদা, তুমি চেয়ারে নেই। কোথায় আছো?— সুমনার গলা ভেসে এলো।

— একটু বাইরে এসেছি সুমনা, হয়তো আজ আর ফিরবো না। আমার এক বন্ধু অসুস্থ।

— কে বন্ধু? আমি তো জানতুম আমিই তোমার একমাত্র বন্ধু। হাসছে সুমনা— রঞ্জননারায়ণ না কি!

সরিৎ বললো— রাইট!

সুমনা সঙ্গে সঙ্গে বললো— আমি আসছি এক্ষুনি। ফোনটা বন্ধ করে দিল। সরিৎ হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো। রঞ্জন বললো— কে?

সরিৎ বললো— সুমনা। আসছে, এক্ষুনি। তোমার হঠাৎ অসুখ করেছে, তাই।

— ওহ্ গড্। রঞ্জন ধপাস করে শুয়ে পড়লো। তারপর বললো— এই কে আছো ঘরটা সাফ করে দাও। দিস মোমেন্ট। হঠাও হঠাও সব। কুইক। জানলাগুলো খুলে দাও তো সরিৎ। পাখা খুলে দাও। এইও! রুম ফ্রেশনার টার আছে? এক্ষুণি স্প্রে করো, এক্ষুনি।

ডাক্তার বললেন— কী ব্যাপার? আপনার অসুবিধেটা কী!— তিনি ব্লাড প্রেশার মাপতে শুরু করছেন। রঞ্জন বলে উঠলো— নাথিং। অ্যাকচুয়ালি আমার একটু বেশি ড্রিঙ্ক করা হয়ে গেছে।

রিসেপশনিস্ট বললো— উনি কাল সারাদিন, আজ এখনও পর্যন্ত কিছু খাননি।

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন— এখন খিদে পাচ্ছে তো! খান যত খুশি খেয়ে নিন।

রঞ্জন রিসেপশনিস্টকে বললো— কিচেনে বলে দিন শুধু স্যুপ আর স্যান্ডউইচ। আর কিছু না। ফর দা টাইম বিয়িং। ডক্টর, ভাইরাল ফিভার হলে তো এইসব মানে একটু হালকা খাওয়াই ভালো।

হতভম্ব ডাক্তারকে পেরিয়ে তার চোখ পৌঁছোয় সরিতের দিকে। —সরিৎ প্লিজ, নাক মলছি, কান মলছি আর করবো না। ডোন্ট ডিসক্লোজ দিস প্লিজ।

এই সময়ে সুমনা ঢুকলো। রঞ্জন চেঁচিয়ে বলে উঠলো— না না, এখন আর জ্বর-টর নেই। কাল মাঝরাত থেকে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা...

সুমনা সামনে আসতে রঞ্জন আবার তড়াক করে উঠে বসলো— আরে সুমনা! তুমি কোত্থেকে? এই সরিৎটা এত বাড়াবাড়ি করে না। বসো, বসো ওদিকে। ঠিক আছে ডক্টর, ব্লাডটেস্টটা কালকেই তাহলে... থ্যাংকিউ বাই!

ডাক্তার ও রিসেপশনিস্ট চোখ চাওয়া চাওয়ি করে মুচকি হেসে চলে গেলেন। খাবার ট্রে হাতে লোক ঢুকলো, সাজিয়ে দিল। রঞ্জন প্রায় বাঘের মতো থাবা দিয়ে একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিল।

সুমনা বললো, যাক খিদে আছে। এটা ভালো লক্ষণ। কলকাতার যা হাল হয়েছে না! ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, এনকেফেলাইটিস...কিছু আর বাকি নেই।

রিয়্যালি! ডিসগাস্টিং!...রঞ্জন বললো।

সুমনা বললো— দয়া করে কদিন একটু রেস্ট নিন, বুঝলেন। নইলে আপনাকে পার্সেলে করে আপনার ঠাকুমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

হেসে রঞ্জন চোখ বড় বড় করে বললো— ওরে বাবা একেবারে বাঘিনীর খপ্পরে।

ইতিমধ্যে সরিৎ আর সুমনার জন্যেও কিছু স্ন্যাকস কফি ইত্যাদি নিয়ে এলো

একটি বেয়ারা।

সুমনা প্লেট থেকে একটা ভাজা মুরগীর টুকরো তুলে নিয়ে বললো— রঞ্জনদা আপনি এখন সুপ ফুপ খান। আমরা আপনাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ভালো-ভালো জিনিস খাবো। সরিৎদা আপনার খিদে পায়নি?

সরিৎ বললো— তা আবার পায় নি? চীয়ার্স রঞ্জন।— আবহাওয়াটা চট করে হালকা হয়ে গেল।

রঞ্জনের ওখান থেকে যখন ওরা বেরলো রাত সাড়ে আটটা তো হবেই। সুমনা ভয় পাবার মতো কিছু দেখেনি, সাধারণ জ্বর-টর হবে রঞ্জনের। সে বললো— কাল কি আমরা অ্যাকাডেমিতে যাচ্ছি সরিৎদা? সরিৎ অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, বললো— ও হ্যাঁ অ্যাকাডেমি। শিওর।

আর্ট এগজিবিশন চট করে বাদ দেয় না সরিৎ। সময় করে নেয়। সুমনা নিজে ছবি আঁকে। তারও বেশ আগ্রহ আছে। বেশ কয়েকজন নতুন শিল্পী মিলে এগজিবিশন করছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই ওরা চেষ্টা করছিল অফিসের পর অ্যাকাডেমিতে যাবার। গাড়ি পার্ক করে সরিৎ কিছুক্ষণ বসে রইলো। কী যেন ভাবছে। একটু পরে বললো— চলো।

সেন্ট্রাল গ্যালারিতে এগজিবিশন। ঢোকার পথে লেডি বানু মুখার্জির ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো সুমনা। দাঁড়িয়েই রয়েছে।

সরিৎ বললো— কী হল, ছবিটা কি তুমি আগে দ্যাখো নি?

— ছবিটা আমাকে কেমন টানে সরিৎদা। কী পার্সোন্যালিটি! পুরোটা বেরিয়ে এসেছে অতুল বোসের হাতে। আই উইশ আই হ্যাড মেট হার।

সরিৎ হেসে বললো— মারা গেলেন। কী উপায়! আমারও তো ইচ্ছে করে বেগম আখতারের সামনে বসে গান শুনি। যদি রবীন্দ্রনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম!

সুমনা বললো— ওঁর সেই সূর্য প্রণামের সময়ে। না ধ্যানস্থ। প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে রুপোলি চুলে...

সরিৎ বললো— তোমার এসব মনে হয়? তুমি কনভেন্টে মানুষ না?

সুমনা বললো— তুমিও তো ক্রিশ্চান স্কুলে কলেজে পড়েছো।

সরিৎ বললো— আগাগোড়া বিলিতি প্রথায় কিন্তু আমি মানুষ হইনি সুমনা। আমার আদি বাড়ি ছিল পাইকপাড়ায়। খাঁটি বাঙালি রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল সেখানে। ঘটপুজো হত। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দ এঁদের আমরা দেবতার মতো ভক্তি করতে শিখেছিলাম।

— দেবতার মতো! এটা একটু যুক্তিহীন নয় সরিৎদা? এটা কি ঠিক? ন্যাশন্যাল

ক্যারেকটারটার ক্ষতি করে না?

— বাঃ বাঃ— সরিৎ হেসে ফেললো— তুমি আমাদের জাতীয় চরিত্র-টরিত্র নিয়েও ভাবো! আমি তো জানতাম তুমি একটা ডাকু মেয়ে, ইমপালসিভ, রোম্যান্টিক...

সুমনা বললো-- তা যদি বলো, ডাকাতি দমন শাখায় আমি ভালোই মানাতে পারবো। এই যে হাত দেখছো, শক্ত লোহা! ক্যারাটের বাবা!

সরিৎ বললো— তাই না কি? তা একদিন পরখ হয়ে যাক।

— যাক, আমার আপত্তি নেই। তুমি কতদিন শিখেছো?

সরিৎ বললো— এক দিনও না! —বলতে বলতে আস্তে আস্তে হাতটা পেছনে নিয়ে গিয়ে সুমনার একটা হাতের পাতা বজ্রমুষ্টিতে ধরলো। সুমনা অবাক হয়ে গেছে। একটু টানাটানি করলো, ছাড়াতে পারলো না। হঠাৎ সরিৎ হাতটা ছেড়ে দিল।

সুমনা বললো-- ওরে বাপ! এ তো আয়রন গ্রিপ। যাকে ধরবে আর ছাড়বে না, উঃ এখনও লাগছে।

— লাগছে? স্যরি। আসলে কী জানো সুমনা। য়ু আর রাইট ইন আ ওয়ে। যাকে ধরি তাকে আমি আর ছাড়ি না। ধরি অনেক ভেবে চিন্তে। তাই ছাড়ার প্রশ্ন নেই। নো নেভার।

সুমনা অবাক হয়ে গেছে-- কিছু হয়েছে? সরিৎদা?

— কই কিছু না তো! সরিতের মুখ স্বাভাবিক।

— তুমি হঠাৎ কী রকম অন্যরকম হয়ে গেলে আমার মনে হল তোমাকে আমি চিনি না! সরিৎ শান্ত গলায় বললো-- তোমাকেই কি আমি চিনি সুমনা! চিনতে সময় লাগে। ধৈর্য লাগে, আই কিউ লাগে।

-- আই কিউও লাগে? মানুষ কি ম্যাথস্ না কুইজ!

দুজনে এগজিবিশন দেখলো। কিন্তু সরিৎ খুব অন্যমনস্ক। সুমনার স্বাভাবিক উচ্ছলতাটা চলে গেল। সে মন দিয়ে ছবিগুলো দেখলো। কোনও মন্তব্য করলো না।

পরে ওরা বেরিয়ে পেছন দিকের দোকানটায় গেল। কফি নিল। সরিৎ বললো— ডবল কাপ দাও ভাই, ছ্যাঁকা লাগবে। আর কিছু খাবে সুমনা?

— না না।

দুজনে সরে এসে একটা সিঁড়ির ধাপে বসলো। চুপচাপ। একটু পরে সুমনা বললো— হঠাৎ তোমার মুডটা কেমন পাল্টে গেল সরিৎদা! আই ডোন্ট লাইক ইট!

-- সবই তোমার পছন্দসই হবে এ কথা তোমায় কে বললো? কনভেন্টের সন্ন্যাসিনীরা?

সুমনা বললো-- তাঁরা তো উল্টো কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন সতর্ক থাকবে। কাউকে বেশি বিশ্বাসও করবে না। অবিশ্বাসও করবে না।

সরিৎ শুধু বললো— হুঁ।

— আমি কি কোনও ভুল করেছি? তোমাকে আঘাত দিয়েছি?

সরিৎ এবার হেসে বললো— তুমি... ভুল? আমাকে... আঘাত? ওহ সুমনা তুমি পারো বটে। হাবে-ভাবে প্র্যাকটিক্যাল দেখালে কী হবে! আসলে...

সুমনা বললো— ইমোশন্যাল ফুল?

সরিৎ তাড়াতাড়ি বললো— তাই বলেছি! তবে সুমনা তুমি তো ছেলেমানুষই... মানে লোকে যেমন একটা কথার কথা বলে না! টেক কেয়ার অব ইয়োরসেলফ সেটাই আমি আন্তরিকভাবে বলছি। আই মীন ইট।

'মীন' শব্দটার ওপর জোর দিল সে। হাঁটতে হাঁটতে দুজনে গাড়িতে উঠলো। সারা রাস্তা আর বিশেষ কথা হল না। সুমনাকে নামিয়ে দিয়ে হুশ্‌শ করে চলে গেল সরিৎ।

৬

যখন সুমনারা ছবি দেখছিল ঠিক সেই সময়ে থিয়েটার রোডের একটা বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে কেয়ার টেকারের সঙ্গে কথা বলছিল একটি যুবক। দেখলেই বোঝা যায় ধনী। যুবকটির মুখ একটু গম্ভীর, বিষণ্ণ। পাশে যে যুবতী দাঁড়িয়ে ছিল তার রূপ আগুনের মতো। তার চেহারাতেও বিষাদ মাখানো। যুবকটির নাম সৌভিকনারায়ণ মুখার্জি। মেয়েটি তেজস্বিনী ভাটিয়া, এখন মুখার্জি।

বিরাট হলঘরের একদিকটা পুরো কাচ দিয়ে ঢাকা। সৌভিক গিয়ে স্লাইডিং ডোর সরালো অমনি গরাদহীন জানলা পথে হু হু করে হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিতে লাগলো তাদের চুল, তেজস্বিনীর আঁচল। ফুলশুদ্ধু একটা ফুলদান কেঁপে উঠলো। সৌভিক বললো— কী হাওয়া দেখেছো! তুমি তো এ ফ্ল্যাটে কখনও আসোনি।

তেজস্বিনী বললো-- আমি একটু আনপ্যাক করি!— সে চলে গেল...পেছন থেকে তাকে উদ্বিগ্ন মুখে দেখে সৌভিক। তারপর সোফায় এসে বসে। একটু পরে কেয়ারটেকার ট্রে হাতে ঢোকে। টেবিলে নামিয়ে রেখে বলে--- সব ঠিক তো সাহেব!

— ঠিক আছে।

— মেমসাব?

— চান করতে ঢুকেছেন বোধহয়। বিরক্ত করো না। পরে দরকার হলে গরম আরেক পট দিও।

ঘাড় নেড়ে লোকটি চলে গেল। সৌভিক কফি ঢাললো কাপে। দু এক চুমুক খেয়ে নামিয়ে রাখলো কাপটা।

বিশাল হলঘরে নানান অলংকরণ। স্কাল্‌প্‌চার, পেন্টিং। প্রত্যেকটাই অপূর্ব। সৌভিক উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে থাকে। আস্তে আস্তে চলে যায় জানলার কাছে। স্লাইডিং পাল্লা খুলে কোমর অবধি ঝুঁকে নিচের দিকে দেখে। ওহ ইটস ডেঞ্জারাস। পরক্ষণেই চমকে ওঠে। পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। চট করে ঘুরে দাঁড়ায়। ওহ তুমি!

তেজস্বিনী এখন একটা হলুদ হাউজকোট পরে দাঁড়িয়ে আছে। তার খোলা চুলে জলের আভাস। বললো— তুমি কি ভেবেছিলে ভূত? না খুনী?

— ওফ্ জিনি। তুমি এমন একেকটা কথা বলো না! কফি খেয়েছো?

তেজস্বিনী ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললো।

স্লাইডিং পাল্লা সামান্য খুলে রেখে সৌভিক বললো— লম্বা ড্রাইভ। খুব টায়ার্ড লাগছে। একটু রেস্ট নিয়ে নিই। কী বলো?

— আমি আবার কী বলবো? টায়ার্ড লাগলে রেস্ট নিতে হবে। বাস। বলাবলির কী আছে?

সৌভিক বললো— পুরো রাস্তাটা আমি একা ড্রাইভ করলাম। তুমি একটু হেল্প করলে পারতে।

তেজস্বিনী বললো— এত খারাপ রাস্তায়? অভ্যেস নেই।

সৌভক কেমন অর্থপূর্ণভা'বে বললো— অভ্যেস থাকে না। করে নিতে হয় অনেক সময়ে। আসল কথা ইচ্ছে। আর সাহস।

তেজস্বিনী বললো— রাইট। আমার ইচ্ছে হলে করবো। নইলে নয়। আর সাহস? আই হ্যাভ প্লেড উইথ টাইগার কাবস্।

সৌভিক এবার হাসলো— কাবস্? গ্রোন-আপ তো নয়।

তেজস্বিনী বললো— আর য়ু শিওর?

সৌভিক তাড়াতাড়ি বললো— এনিওয়ে কোথায় বেড়াতে যাবে বলো!

— এই তো এলাম! এসেছি তো!

— আই মীন পোস্ট-ম্যারেজ বেড়ানো। এটা তো আফট্রল আমার কাজের জায়গা।

— যেখানে তোমার ইচ্ছে।

— তোমার কোনও বিশেষ ইচ্ছে নেই?

— আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের দাম কী! ডেসটিনি। মেনে নিয়েছি।

এবার সৌভিক কেমন কাতর গলায় বললো— জিনি। তুমি কেন আমার ওপর রেগে আছো?

— রাগবো কেন? তোমারই বা কী দোষ?— তোমারও ওই, ডেসটিনিই!

সৌভিক বললো— আমি ওভাবে ব্যাপারটা দেখছি না কিন্তু। নিয়তি ভবিতব্য... নো। বিশ্বাস করো আমি অতীত একেবারে মুছে ফেলবো। তোমাকে আমি সুখী করবোই আমার প্রতিজ্ঞা।... অবশ্য তুমি যদি চাও।

— আর না চাইলে?

সৌভিক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো— আমার দিক থেকে সেন্ট পার্সেন্ট চেষ্টা থাকবে। বনের প্রাণীও তো স্নেহ-ভালোবাসায় বশ হয়...ফিরে ভালোবাসে...তারপর...তার...পর...ওই ডেসটিনি।

তেজস্বিনী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ কি রকম মরিয়ার মতো বলে উঠল— আমাকে কোনও নির্জন সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে পারো?

সৌভিক উৎসাহিত হয়ে বললো— সেটাই তো বলছি। একটু ভাবো। আমি চান করে আসি।

সৌভিক চলে যায়। আলো জ্বলে না। অন্ধকারে তেজস্বিনী একা বসে থাকে।

জানলার দিকে মুখ। আস্তে আস্তে চাঁদ ওঠে। হঠাৎ চাঁদের দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় তেজস্বিনী বলে ওঠে— আই হেট ইট। হেট হার, হেট দেম অল।

রাতে ঘুম নামে। শহর জুড়ে ঘুম। সৌভিক অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করে। পাশে তেজস্বিনী একেবারে নিশ্চুপ, অনড়। একসময়ে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। অস্ত যেতে যেতে চাঁদ বলে যায় হেট ইট, হেট হার, হেট দেম অল।

দশতলার ফ্ল্যাট। সকাল হতেই চতুর্দিক ঝলমল ঝলমল করতে থাকে। যানবাহনের আওয়াজ উঠে আসছে এই দশ তলাতেও। দুজনেই চান সেরে নিয়েছে। এসে বসলো। তেজস্বিনী একবার উঠে রান্নাঘরে গেল।

— কী করছো জিনি? সৌভিক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

— আসছি!— ক্ষীণ গলা ভেসে আসে।

একটু পরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে কেয়ার-টেকার আসে। তেজস্বিনী বসতে বসতে বলে-- সৌভিক উপ্‌মা খাবে তো?

-- খাবো মানে? উপ্‌মা আই লাভ।

-- সেইজন্যেই। একটু করতে বললাম।— সে হাত বাড়িয়ে পট থেকে চা ঢালতে লাগলো।

সৌভিক নরম চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটু পরে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করলো— ভালো লাগছে?

— কী?

-- জায়গাটা? এই ফ্ল্যাটটা? অনেক উঁচুতে তো! অন্যরকম...চারদিকে লোকালয়ের আওয়াজ... সাধারণ আই মীন নরম্যাল লাইফ...

তেজস্বিনী চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললো— জায়গাটা ভালো, ফ্ল্যাটটা ভালো আর সৌভিক...নিচু গলায় সে বললো— তুমিও ভালো।

সৌভিক বেশ কিছুক্ষণ অভিভূতভাবে বসে রইলো, তারপর তেজস্বিনীর হাতটা তুলে ধরে কিছুক্ষণ হাতের পাতায় গাল রাখলো। তারপর খুব সন্তর্পণে একটা চুমু খেলো। প্রায় ভেজা গলায় জিজ্ঞেস করলো-- কিছু ভাবলে? জিনি?

— কী বিষয়ে?

— ওই যে কোথায় যেতে চাও।

— বললাম তো নির্জন... সুন্দর... কেউ দেখবে না, শুনবে না, কাউকে ভয় করতে হবে না, মেনে চলতে হবে না।

— ঠিক আছে। ঠিক আছে। ধরো ডালহৌসি এখনও খুব নির্জন। অরুণাচল প্রদেশ। নির্জনও সুন্দরও। কিন্তু কমফর্ট পাবে না। যদি বাইরে যেতে চাও তো হংকং সিঙ্গাপুর...

— ওহ্ নো। আচ্ছা আলমোড়ায় মায়াবতী আশ্রম বলে একটা জায়গা আছে

না?

-- আছেই তো! মায়াবতী যাবে? শিওর। তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে...

তেজস্বিনী উঠে দাঁড়ালো--- তাহলে চলো।

সৌভিক স্নেহের হাসি হেসে বললো— আরে! এক্ষুনি? ট্রাভল এজেন্টের সঙ্গে কথা বলি! টিকেট বুক করি।

তেজস্বিনী গোঁয়ারের মতো বলে উঠলো--- প্লেনে যাবো। কোথাও থামবে না। সোজা গিয়ে নামিয়ে দেবে বরফের মাঝখানে। কিম্বা কোনও পীকে। কী যেন আছে ওখানে? ত্রিশূল...নন্দাদেবী...বলতে বলতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। নিঃশব্দ কান্না। শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে।

সৌভিক উঠে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত রাখলো— জিনি, কেঁদো না, প্লিজ, আমার কথাও একটু ভাবো। এক-টু। ঠিক আছে তোমাকে উনি জোর করেছেন। কিন্তু সে তো আমাকেও...টেক ইট স্পোর্টিংলি। একটু থেমে বললো— দ্যাখো না, একটু খোঁজখবর করি। তারপর তোমাকে নিয়ে আমি একেবারে বিদেশে চলে যাবো। য়ু'ল হ্যাভ আ নিউ লাইফ দেয়ার। নিউ। একেবারে ভুলে যাবে সব দুঃস্বপ্নের মতো। অন্তত চেষ্টাটা করার ভরসা আমায় দাও জিনি!

তেজস্বিনী সৌভিককে জড়িয়ে ধরলো। কাঁধে মাথা রেখে অঝোর ধারে কাঁদে বলে— সৌভিক য়ু অ্যান্ডর্স্টান্ড। ডোন্ট য়ু? ডোন্ট য়ু? সৌভিক তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেয় যেন সে স্বামী নয়, দাদা।

৭

তিন চার দিন হল রঞ্জন অফিস যাচ্ছে। সল্টলেকে অফিস। সাড়ে ছটা নাগাদ সে অফিস থেকে বেরোতে পারলো। বাইকটা চালু করলো। বাইপাস দিয়ে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে শাঁৎ শাঁৎ করে গাড়ি চলে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা সিলভার গ্রে হন্ডা সিটি তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে। গাড়িতে চালকের আসনে এবং তার পাশে রঞ্জনের অত্যন্ত চেনা দুই মুখ। ওরা রাস্তার সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু দেখছে না, শুনছে না, একাগ্র। বিশেষত মেয়েটি একেবারে পাথরের মূর্তির মতো। বিস্ফারিত চোখে সেদিকে চাইলো রঞ্জন। জিনি! জিনি! সে চিৎকার করে উঠলো স্থানকাল ভুলে। 'ড্যামিট' লাথি মেরে বাইকটা একটা হেয়ার পিন বেন্ড নিলো তারপর তাড়া করলো গাড়িটাকে। কিন্তু বেন্ডটা পেতে খানিকটা সময় গেছে। অজস্র গাড়ির স্রোত। তার মধ্যে মিশে রুপোলি হন্ডা কোথায় মিলিয়ে গেছে। উল্টোডাঙা পর্যন্ত তাড়া করলো সে। তার আর তেমন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। দুপাশ দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, মুখ বাড়িয়ে গালাগাল বা তিরস্কার করছে কেউ কেউ। লেন বদলে বদলে ধারে নিয়ে এসে কোনক্রমে সে বাইক থামায়। তারপর সিটের ওপর ঘুঁষি মারতে থাকে— জিনি! জিনি। জিনি! অর্ধেক চিৎকার, অর্ধেক কান্না।

বাইক শহরের দিকে মোড় নেয় ক্রমশ। প্রায় লক্ষ্যহীন ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় রঞ্জন! বাইক পার্ক করে। চাবি নিয়ে দু তিন লাফে ওপরে উঠে যায়। ঘরের দরজা খোলে। ঢুকে শব্দ করে বন্ধ করে দেয়, তারপর বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে। দুহাতে চুল আঁকড়ে ধরেছে, ভাঙা গলায় সে চিৎকার করতে থাকে, জিনি! মাই জিনি! ওহ্ গড্। ওহ্ গড্...

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিছানাটা যুদ্ধক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। রঞ্জন শান্ত হয়ে শুয়ে থাকে উপুড় হয়ে। তার হাত মুঠি পাকানো। কোথায় গেল ওরা? কলকাতার বাইরে? তবে কলকাতায় এসেছে! কবে এলো? কেন? ওহ্ কোয়েশ্চনস্ কোয়েশ্চনস্! আর কোনও মানে নেই এ সবের। কিছুর কোনও মানে নেই।

চুপচাপ শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফোঁসে রঞ্জন। হঠাৎই সেলফোনটা তুলে নেয়— সরিৎ! সরিৎকে ডেকে কী লাভ! উপদেশের ঝুড়ি বার করবে। ডু দিস। ডু দ্যাট। য়ু আর টু ব্লেম...হি মেকস মি ম্যাড।

রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। আজকে বিকেলেও ছবির প্রদর্শনী ঘুরে এসেছে সুমনা আর সরিৎ। সুমনা বিকেলের দেখা ছবিগুলোর কথা ভাবছে। তারা অফিসের জন্য ছবি কিনতে চায়। লেডি রানুর ছবিটা তাকে ছাড়ছে না। হঠাৎ সে বুঝতে পারলো কেন।

একটা মানুষের কথা বারবার শুনলে, তার সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। লেডি রাণুর ছবিটা দেখলেই তার মনে পড়ছে একটা নাম রাজেশ্বরী দেবী। শাকম্ভরীর দ্বীপের কর্ত্রী। উনি বোধহয় কতকটা এইরকম। আরও বয়স্ক। কিন্তু এমনি বয়সে উনি নিশ্চয়ই এমনি ছিলেন। ব্যক্তিত্বটা যেন তাকে চুম্বকের মতো টানছে। একজন সেকালের মহিলা, স্বামী যুদ্ধে মৃত। পুত্র-পুত্রবধূ অ্যাকসিডেন্টে চলে গেলেন। একমাত্র ছেলে। চারটি ছোট ছোট শিশু নিয়ে বিরাট সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন। সবদিকে নজর। আশ্চর্য মানুষ! এঁদের কথাই বইয়ে লেখে। সেল ফোনটা বাজলো। আজ রাতের মতো সে এক্ষুনি সুইচ অফ করে দিত— হ্যালো।

ওদিক থেকে ভারী ভাঙা গলা ভেসে আসে— সুমন। আসবে একবার? আই নিড য়ু।

— রঞ্জনদা? কী ব্যাপার? আপনার গলা এরকম শোনাচ্ছে কেন? আবার কিছু বাধিয়েছেন?

— সুমন আই নিড য়ু। প্লিজ কাম।

— এখন? এই রাতে!

— এক্ষুনি। আমার অবস্থা খুব খুব খারাপ। আ অ্যাম ইন ডিপ ডিপ ট্রাবল।

উদ্বেগ গলায় উঠে এসেছে। সুমনা বললো— সাড়ে আটটা বেজেছে রঞ্জনদা। এখন কোথাও যাওয়া যায়? মিসেস রডরিগস আমাকে বার করে দেবেন, তাহলে। সরিৎদাকে একটা ফোন...

— ফর গডস সেক সুমন। তুমি যদি আসতে না পারো ঠিক আছে, কিন্তু সরিৎ? নো।

— কী হল? সামথিং সিরিয়াস!

— অবভিয়াসলি! আই অ্যাম ডেসপ্যারেট।

— কোথায় আপনি?

— আমার হোটেলের ঘরে, আমি কাউন্টারে বলে দিচ্ছি তোমার নাম।

— কী মনে করবে ওরা?

— কেউ কিছু মনে করবে না। প্লিজ। তোমাকে বেশিক্ষণ আটকাবো না।

সুমনা এখনও পোশাক বদলায়নি। সে বেরিয়ে পড়লো ঘরে চাবি দিয়ে। একটা ট্যাক্সিতে উঠে ফাঁকা রাস্তায় মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে গেল হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট। হোটেল রিচ। কাউন্টারে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো— আর.এন.মুখার্জি কি অসুস্থ? আপনারা কিছু জানেন?

রিসেপশনিস্ট বললো— ম্যাডাম সুমনা? আপনার আসবার কথা উনি বলে রেখেছেন। প্লিজ চলে যান। উনি অপেক্ষা করছেন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে সুমনা। কীরকম একটা উত্তেজনা, অস্থিরতা, ভয় তাকে

পেয়ে বসেছে। নিজের মন নিজেই বুঝতে পারছে না সে। কেন রঞ্জন এভাবে তাকে এই সময়ে ডাকলো! কাউন্টারে বলে রেখেছে। কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে বলত না। খুব বিপজ্জনক প্রায় এই নটা রাতে কোনও অর্ধ পরিচিতি পুরুষের হোটেলের ঘরে যাওয়া। কেন সে এল? এটা এড়ানোই তো উচিত ছিল তার। সরিৎদা সঙ্গে থাকলে ঠিক আছে। সরিৎদাকে ডাকতে বারণ করেছে। ভীষণ সন্দেহজনক পরিস্থিতি। সুমনা তুমি এত তাড়াতাড়ি মাদারের সতর্কবাণী ভুলে গেলে? কেন যাচ্ছো? ফেরত যাও। হঠাৎ ভেতর থেকে কে বলে উঠলো এ তো সামান্য একটা আপদ! আপদও নয়। আশঙ্কা! এটুকু সামলে নেবার বুদ্ধি ক্ষমতা তোমার আছে সুমনা। নেই? সে দরজায় টোকা দিল।

— প্লিজ কাম ইন— ভারী গলা ভেতর থেকে। দরজা খোলা। রঞ্জন তার মুখোমুখি বসে আছে। ঘরে মৃদু আলো। ভালো করে দেখা যাচ্ছে না সব। সুমনা আগের দিন আলোর ঠিকানা জেনে গেছে। সে সুইচ টিপে দিল। লাফিয়ে উঠলো ঘর তার বিছানা, বেডসাইড টেবল, কার্পেট, ক্যাবিনেট...সমস্ত নিয়ে। রঞ্জন এখনও তার অফিসের পোশাকেই বসে আছে। চুলগুলো অবিন্যস্ত। টাইয়ের নটটা আলগা। তাকে সত্যিই খুব বিপর্যস্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে।

দরজার কাছ থেকেই সুমনা বললো— কী হয়েছে রঞ্জনদা? হঠাৎ এমন জরুরি ফোন? এই রাতে?

রঞ্জন হঠাৎ দু হাতে মুখ রেখে একেবারে ভেঙে পড়ে— সেভ মি সুমন আ অ্যাম ইন লাভ উইথ য়ু। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচবো না।

সুমনা হতভম্ব। সে কোনমতে বললো— কী বলছেন? হঠাৎ এরকম?

রঞ্জন বললো— বলতে পারিনি, ভয় পাচ্ছিলাম যদি কিছু মনে করো। যদি না বলো। যদি আর কাউকে ভালোবাসো! তুমি জানো না তুমি সরিৎকে চাও ভেবে আমি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি।

সুমনা খুব মৃদু গলায় বললো— সরিৎদা আমার খুব বন্ধু। এত ভালো লোক আমি আর দেখি নি।

রঞ্জন বলে উঠলো— বিশ্বাস করো সুমনা আমিও খারাপ লোক না, হয়তো একটু ক্ষ্যাপাটে, বাট আ অ্যাম ম্যাডলি ইন লাভ।

সুমনার গলা কেঁপে যাচ্ছে। বললো— এ হয় না রঞ্জনদা। আপনাদের বনেদি বংশ অত ধনসম্পত্তি... ট্র্যাডিশন... আমি একটা অনাথ মেয়ে, কর্পদকহীন তার ওপরে ক্রিশ্চান। আপনি ওঁকে আগে জানান।

— শী ইজ আ গর্গন। ওঁকে আমি আমার জীবনে বারবার এনট্রি নিতে দেবো না। তুমি ক্রিশ্চান কি অরফ্যান আমার দেখার দরকার এই। তুমি চমৎকার মেয়ে, এরকম আমি আর দেখিনি। এত পিওর, ইনটেলিজেন্ট, স্মার্ট, অথচ এত সহানুভূতিশীল,

আমার কি কাউকে ভালোবাসারও অধিকার নেই? সম্পত্তি, বংশ এইসব উড়ো আপদ সবসময়ে মাঝখানে এসে দাঁড়াবে?

রঞ্জন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে।

সুমনা বললো— আমাকে একটু ভাববার সময় দিন...প্লি..জ— বলতে বলতে দরজার নব-এ তার হাত পৌঁছলো, হাতটা কাঁপছে। শাদা হয়ে গেছে।

-- ট্রাস্ট মি সুমনা। প্লি-জ। আমরা একটা ছোট্ট ঘর বাঁধবো। শুধু তুমি আর আমি। নো শাকম্ভরীর দ্বীপ। নো রাজেশ্বরী দেবী। নো সম্পত্তি। নিজেদের কেরিয়ার আমরা নিজেরা গড়ব। তুমি আমার আইডিয়্যাল ওয়াইফ। ন্যাকা নয়, রাগী নয়। ডাউন টু আর্থ। তোমার আমার ইনটারেস্ট সব একধরনের, তুমি যদি আজ কথা না দাও...তাহলে আমি...

— তাহলে কী?

রঞ্জন মাথার চুল মুঠো করে ধরে বললো— জানি না জানি না।

সুমনার সামনে সরিতের মুখটা অদ্ভুতভাবে ভেসে উঠলো। সে বললো— সরিৎদার সঙ্গে আমার ওরকম কোনও সম্পর্ক নেই রঞ্জনদা। আপনার তো অস্থির হবার কিছু নেই। কিন্তু প্লিজ আমাকে একটু ভাববার সময় দিতে হবে।

রঞ্জন বললো— প্রমিস। তুমি সরিৎকে এসব...

— বলবো না। বলে সুমনা দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো। আনমনে রিসেপশনিস্টের হাসির উত্তরে হাসলো। বেরিয়েই সামনের ট্যাকসি ধরলো। দশ বারো মিনিটের মধ্যে নিজের ঘরে পৌঁছে গেল।

পরবর্তী কদিন স্বপ্নের মধ্যে কেটে যায় তার। এ কি সত্যি হতে পারে? অসম্ভব! অলীক! অফিসের পর সে ক্যাথিড্রালে চলে যায়। অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করে। হাঁটতে থাকে, হেঁটে হেঁটে সমস্ত দুশ্চিন্তা যেন ক্ষইয়ে ফেলবে সে। এবং সর্বত্র, দিনে রাতে কাজে বিশ্রামে রঞ্জনের ফোন তাকে উতলা করে দেয়।

— সুমনা, আই লাভ য়ু।

— সুমনা প্লিজ ট্রাস্ট মি।

— সুমনা আ অ্যাম ডাইং টু মিট য়ু। এবং এবং এবং।

সে কি মাদার, সিস্টার সুচরিতার কাছে যাবে? অনেকবার ভাবে সে। ভেতর থেকে কে বলে সুমনা নিজের কাছে জবাব খোঁজো। তুমি ছাড়া তোমার মন কে জানবে? এবং সেইভাবে জানতে গিয়ে সুমনা আবিষ্কার করে তার ভেতরটা রঞ্জনের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে ঠিক যেমন সূর্যমুখী থাকে সূর্যের দিকে। প্রতিমুহূর্তে সে রঞ্জনকে ভালোবেসেছে কিন্তু তার পাওয়ার অতীত বলে কখনও ভুলেও সে হাত বাড়ায় নি। রঞ্জনের দ্বীপ, রঞ্জনের ঠাকুমা এসবও একটা রোমাঞ্চকর আকর্ষণ। কিন্তু আসল আকর্ষণ রঞ্জন নিজে। তার সুঠাম, চটপটে দেহ, তার গলার অর্গ্যান স্বর, মোহময় চাউনি,

তার খামখেয়ালিপনা সব কিছুতে তাব সাবলীলতা। শুধু প্রশংসা নয়। এতদিন সে ভেতরে ভেতরে একজনকে ভালোবেসে এসেছে। অপ্রাপ্য বলে শুধু চায় নি মুখ ফুটে।

নিজের কাছে জবাব পাওয়ার পর সে আর দেরি করলো না। সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালে রবিবারের প্রার্থনায় যোগ দিল। বাইরে বেরিয়ে দেখলো একটা মেঘমুক্ত নীলাভ দিন। ঘাসের ওপর নতজানু হয়ে বসে পড়ে সে রঞ্জনের নম্বর টিপলো।

— হ্যালো।

সুমনা বললো— আমি রাজি। বলেই সুইচ অফ করে দিল ফোনটার।

অতঃপর ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে দুজনে। সরিৎ আর মল্লিকা রঞ্জনের দুই সহকর্মী এরা সাক্ষী। সরিৎ গম্ভীর। মল্লিকা উচ্ছল।

রঞ্জনকে এত প্রশান্ত দেখাচ্ছে যে চেনা যাচ্ছে না। সে হাসিমুখে বললো— সিঁদুর পরাবো?

সরিৎ বললো— এটা সিভল ম্যারেজ রঞ্জন, তোমরা যে যার ধর্মমত অনুযায়ী চলতে পারবে। কী সুমনা?

সুমনা অপ্রতিভভাবে বললো— না, মানে সিঁদুরটা ঠিক...

রঞ্জন হেসে বললো— ঠিক আছে ঠিক আছে। সিঁদুর অর নো সিঁদুর...তুমি এখন থেকে মিসেস রঞ্জননারায়ণ মুখার্জি।

মল্লিকা বললো— বউয়ের নামটা কেড়ে নিচ্ছেন কেন রঞ্জনদা, টূ ব্যাড। সুমনা মুখার্জি। কী সুমনা?

সুমনা হেসে বললো— একশবার।

সরিৎ হাসল, বললো— যাক। তবু ভালো।

সেদিন সরিৎ-সুমনার হোটেলেই বিয়ের খাওয়াটা হল। সরিতের আয়োজন। তারপর ওরা চলে গেল প্রিয়নাথ মুখার্জি লেনের একটা ছোট ফ্ল্যাটে।

এইখানেই পরে একদিন সরিৎ রঞ্জন মুখোমুখি হয়।

ফ্ল্যাটটা ছোট, সাধারণ, নতুন রং করা। পরিচ্ছন্ন। বাইরের ঘরে বেতের আসবাব। একদিকে নিচু তক্তপোশে গালচে পাতা। দুজনে চুপচাপ বসে আছে। সুমনা আপাতত নেই। সন্ধেবেলা।

রঞ্জন উচ্ছলভাবে বলে উঠলো— কী রকম দেখছো সরিৎ?

সরিৎ বললো— দেখাটা বড় না বোঝাটা বড় ভাবছি রঞ্জন। ভেবে স্থির করতে পারছি না।

দুজনে দুজনের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পর সরিৎ বললো— কাজটা কি তুমি ঠিক করলে?

রঞ্জন উঠে দাঁড়ায়।— চমৎকার! আমার নিজের ইচ্ছেমতো ভালোবাসবার অধিকারও নেই।

সরিৎ বললো— নিশ্চয় আছে। তবে এই সেদিন যে তেজস্বিনীর বিয়ে হয়ে গেছে বলে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে।

— সরিৎ। বোঝবার চেষ্টা করো। দ্যাট চ্যাপটার ইজ ওভার। আমার ওই কষ্টটা কেটে গেছে সুমনাকে পেয়ে। আমি ওকে ভালোবাসি, গডস্ ট্রুথ।

সরিৎ সংক্ষেপে বললো— আই হোপ সো।

— তোমার কেন এত সন্দেহ হচ্ছে আমি জানি না সরিৎ।

সরিৎ সোজাসুজি ওর চোখের দিকে চাইলো, বললো— তুমি এই ধরনের ছোটখাটো ছাপোষা অ্যাডভেঞ্চারহীন গৃহস্থজীবনের জন্যে তৈরি নও রঞ্জন, স্বীকার করো।

— ভাবছি, রঞ্জন বললো— কিন্তু এটাও তো ঠিক ওই অ্যাডভেঞ্চার আধিপত্য ধনসম্পত্তি ওই জীবনের আসল চেহারাটা আমি দেখতে পেয়েছি। মানুষ তো বদলায়।

— আই সিনসিয়ারলি হোপ সো...সরিৎ বললো।

এই সময়ে সুমনা হই হই করে ঢুকলো। তার সঙ্গে মুটে।— কী ব্যাপার? পুরো বাজারটাই তুলে আনলে নাকি? রঞ্জন বললো। সুমনা উজ্জ্বল হেসে বার করতে লাগলো তার সওদা। বেডকভার, পাপোশ, ওয়ল হ্যাঙ্গিং,...ভাবতে পারছো? এত সস্তা এত সুন্দর!

রঞ্জন বললো— নাহ, ভাবতে পারছি না। সে উঠে গিয়ে সুমনার গালে নাক ঘষলো। সরিৎ মুখটা ফিরিয়ে নিল।

আরও জিনিস নামাচ্ছে সুমনা। বললো— সরিৎদা এই মুখোশটা দেখো। দারুণ না? আফ্রিকান সর্দার, বান্টু না কী যেন বলে? কী কালারফুল!

রঞ্জন হঠাৎ ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললো— উঃ, তুমি আর কিছু পেলে না? দ্যাট ওয়াইল্ড গডড্যামড্ থিং...সে উঠে চলে গেল।

সুমনা বললো— কী হল সরিৎদা? এটা খারাপ?

সরিৎ হাত উল্টে বললো— ওয়াইল্ড তো! বোধহয় ওর আইল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

— ইশশ্ সুমনা চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। তাই? আমাকে আরও সাবধানে চলতে হবে।

সরিৎ কেমন একটা তিক্ত হাসি হেসে বললো— যা জানোই না, সে বিষয়ে সাবধান তুমি হবে কী করে?

— একটা সামান্য মুখোশ দেখে যদি ওর এত রাগ, এত ঘেন্না...আচ্ছা সরিৎদা এ কেমন ঠাকুমা? এ কেমন স্নেহ? বাবা-মা নেই। ছোট থেকে মানুষ করেছেন এত আদরে। নাতির ইচ্ছে-অনিচ্ছের একটুও দাম দেবেন না? ওই জঙ্গুলে দ্বীপে পড়ে থাকতে হবে? কী সাংঘাতিক রাগী, হিংসুটে, পজেসিভ টাইপ!

সরিৎ খুব শান্ত গলায় বললো— অনেকগুলো বিশেষণ ব্যবহার করে ফেললে সুমনা। কিন্তু কে জানে! আমরা তো ভদ্রমহিলাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখিনি। চিনি না।

একজনের রি-অ্যাকশন থেকে যতটুকু জানা যায়। মানবচরিত্র বড় জটিল সুমনা। কে জানে কোথায় কী ঘটছে, কেন ঘটছে! যাও গে তুমি তোমার ঘরটর সাজাও। আমি চলি। ওকে বলে দিও।

সুমনা সরিতের চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। সরিৎদা মাঝে মাঝে কী যে সব রহস্যময় সংশয়ের কথা বলে! কেন যে বলে! তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। জটিলের কী আছে! সরিৎদা নিজে কি জটিল? মোটেই না। যা বলে তা করে। অত্যন্ত আন্তরিক। মল্লিকা, রুমা, কেতন, তার কলীগরা সকলেই কী ভালো! আর রঞ্জন! সরিৎদা কি সত্যিই তাকে?— নাহ্, মোটেই না। শেষ কথাগুলো সে উচ্চারণ করে বললো। রঞ্জন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জানতো না। রঞ্জন বললো— কী নাহ্!

— কী, বলবো?

রঞ্জন বললো— শুনতেই তো চাইছি।

সুমনা বললো— তুমি বলেছিলে না!

— কী?

— ওই সরিৎদাকে নিয়ে তুমি জেলাস! ইজ ইট পসিবল রঞ্জন? তুমি থাকতে আর কারো কথা মনে পড়ে? মনে আসে? সত্যি কথা বলবো রঞ্জন। আমি তোমাকে প্রথম দিনই। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। তোমার অনেক অনে-ক আগে থেকে।

রঞ্জন ভীষণ খুশি হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো, বললো— য়ু আর রং। যে-ই দেখলাম একটা চমৎকার মিষ্টি মেয়ে নেভি ব্লু স্কার্ট আর লাল টুকটুক টপ পরে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে ভীষণ কেজো কেজো মুখ করে কথাবার্তা বলছে অমনি রঞ্জন নারায়ণ কাত। ওইজন্যেই তো সরিতের কাছে অত যেতাম!

সুমনা বললো— আমার কী ভয় ছিল জানো! তুমি সব দিক থেকেই একেবারে অন্য লেভেলের। আমার থেকে অনেক উচুতে, অনেক দূরে। আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখতাম। সত্যি পাবো কল্পনাতেও আসেনি। জানো, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না। মনে হয় স্বপ্নই দেখছি।

রঞ্জন বললো— ভোরের স্বপ্ন। সবসময়ে সত্যি হয়। আই অ্যাডোর য়ু, সুমন। সে সুমনাকে জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে চুমো খেল।

— রঞ্জন, কিন্তু ঠাকুমাকে তোমার জানানো উচিত। তিনি যেমনই হোন।

— উহুঁ, রঞ্জন বিদ্রুপের গলায় বললো— রাজরাজেশ্বরী থাকুন না বসে তাঁর স্বপ্ন নিয়ে। ছোট্ট রঞ্জননারায়ণ ঠাকুমার কোলে বসে বাঘের বাচ্চা নিয়ে খেলা করছে। অল হিজ লাইফ। কোনদিন বড় হবে না। ঠাকুমা যা হাতে তুলে দেবে তাই নিয়েই আঙুল চুষবে। সে বাঘের বাচ্চাই হোক আর ছেলের হাতের মোয়াই হোক।

সুমনা তার মুখে আঙুল চাপা দিল— প্লিজ এভাবে বলো না রঞ্জন। আমার খুব খারাপ লাগে। গিল্টি লাগে। বাবা-মা-ভাই-বোন। ফ্যামিলি কী জিনিস কোনদিন

জানিনি।

রঞ্জন বললো— ফ্যামিলি কী জিনিস জানো নি দ্যাটস গডস গ্রেস।

তার মুখ কালো হয়ে রয়েছে।

সুমনা বললো— কী যে বলো, পরিবারই তো সবসময়ে পাশে থাকে, ফ্যামিলিই ওষুধ।

রঞ্জন বললো— শিওর, তবে বড্ড তেতো।

দুজনেই হেসে ফেললো।

সুমনা বললো— দ্যাখো, আমি একদিন চুপি চুপি শাকম্ভরীর দ্বীপে চলে যাবো ঠিক।

— এই। এসব ভাবলে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি রেগে যাবো। খবরদার নিজের আত্মসম্মান হারাবে না।

সত্যিসত্যিই সুমনা মাঝে মাঝে ভাবতো, হুট করে একদিন চলে গেলে কী হয়! চোখের সামনে দেখলে, নিচু হয়ে সম্মান জানালে কি রাজেশ্বরী দেবী তাকে কাছে ডাকবেন না? কিন্তু ভাবনা ভাবনা-ই।

সুমনা যাই ভাবুক, রঞ্জনের আপত্তি আছে এমন কাজ সে করে না। রাজেশ্বরী দেবী ও তাঁর দ্বীপ সম্পর্কে কৌতূহল কুলুপ বন্ধ হয়ে থাকে, সে মন দিয়ে সংসার করে। কিন্তু রঞ্জন ঘরে থাকতেই চায় না। সে হয় বাইক নিয়ে বাইপাসে ঝড়ের বেগে চলবে। নয় যাবে রেস্তোরাঁয়, বারে, ডিসকোথেকে। সুমনা বুঝতে পারে বড়লোকের ছেলে এইটুকু ফ্ল্যাটে হয়তো ভালো লাগছে না। সে প্রাণপণে চাকরিতে উন্নতি করতে চেষ্টা করে। শিগগিরই তার প্রোমোশনও হয়। লিয়াজঁ অ্যান্ড মিডিয়া পার্সন। তার নিজস্ব ছোট অফিস। নাইট শিফট বলে কিছু নেই। সারাক্ষণ একপায়ে খাড়া থাকতে হয় না। কোনও কোনও দিন বেশি রাতে বাড়ি ফেরে রঞ্জন। মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ থাকে। খায় না। সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। আবার কোনও কোনওদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি আসে, বলে— চলো ঘুরে আসি।

রঞ্জনকে টেনিসে উৎসাহ দেয় সুমনা। ও নিয়মিত খেলছে আজকাল। ওর টুর্নামেন্ট থাকলেই সুমনা যায়। সরিৎও যায় কোনও কোনওদিন। রঞ্জন শুরুটা করে খুব উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু একটু পরেই কেমন মিইয়ে যায়। সমানে ডাবল্ ফল্ট, সমানে সোজা মার ফসকে যাচ্ছে, সুমনা ইশ ইশ করে ওঠে ওর মার দেখে। সরিৎ হেসে বলে— স্টেফি গ্রাফ দর্শকাসনে, আগাসি খেলছে, তবু কিছু হচ্ছে না। র‍্যাকেট আছড়ে ফেললো রঞ্জন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলালো না। সামান্য ম্যানার্সও কি ও ভুলে গেল? সুমনা ভাবে, ওই ছেলেটি নতুন খেলছে, ওর সঙ্গে তো হাসতে হাসতে জেতা উচিত ছিল রঞ্জনের।

— ওর খেলায় একদম মন ছিল না, বুঝলে সরিৎদা।

সরিৎ অন্যমনস্ক। বললো— ফ্রাসট্রেশনটা কিসের? সুমনা ঝগড়া বিবাদ কিছু...

ঝগড়া-বিবাদ ওর সঙ্গে আমার? হাসালে সরিৎদা।

সরিৎ বললো — ঝগড়া-বিবাদ খুব সাধারণ ব্যাপার সুমনা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়েই থাকে।

আমাদের মধ্যে হয় না। আমাকে অধৈর্য হলে চলবে না সরিৎদা। কত বড় আঘাত ওর, ওর সব ক্ষত ভুলিয়ে দেবার জন্যই তো আমার যত চেষ্টা।

সরিৎ একটু চুপ করে থেকে বললো— তুমি খুব বদলে গেছে সুমনা, আগে কত লাইভলি ছিলে, জলি...ছেলেমানুষ...সে সব দিন তো খুব দূরেও নয়...অথচ কোথায় গেল তোমার সেই সাহস? তেজ! ইনডিপেন্ডেন্ট স্পিরিট...তুমি ফিরে এসো সুমনা।

সরিতের গলায় কেমন একটা অচেনা আবেগ, তাগিদ যা আগে কখনও সুমনা শোনে নি। সে বললো — কোথা থেকে।

— ওই যেখানে চলে গেছ, সেখান থেকে। আমার মনে হয় তুমি একটা অন্ধকার ভয়ের জগতে বাস করছো, কাম ব্যাক টু ইয়োর রিয়্যাল সেলফ্। আমি তো আছি। বলিনি যে কোনও অসুবিধেয় আমাকে বলতে দুবার ভাববে না!

সুমনা একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলো— বাজে কথা বলো না সরিৎদা। বিয়ে হলে একটু চেঞ্জ হবেই। এখনও আগেকার মতো লাফ-ঝাঁপ, তর্ক, যখন খুশি সিনেমা, বেড়ানো এগুলো পারছি না। সেটাই স্বাভাবিক। আর প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড আমাদের একটা প্রাইভেট লাইফ আছে। সেখানে যদি কোনও সামান্য গোলমালও হয় একজন থার্ড পার্সন, আউটসাইডারের কাছে সে কথা বলতে যাবো? লেট মি গ্রো আপ...

যত বলছে সে সরিতের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে। শেষকালটা যেন সপাটে একটা চড় খেলো।

রঞ্জন বেরিয়ে এলো, এই সময়ে। উচ্ছ্বলভাবে বললো— কী? খুব ডিস্যাপয়েন্টেড হয়েছো তো?

সুমনা হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা— দূর, খেলায় ওরকম হারজিত আছেই। ছাড়ো তো!

রঞ্জন বললো— এনিওয়ে সুমন, তোমাকে বাড়িতে রেখে আমি আর সরিৎ একটু ঘুরে আসি।

সুমনা বললো— কেন? আমি গেলে তোমাদের অসুবিধে হবে?

রঞ্জন বললো— তুমি ভুলে যাচ্ছো সুমনা, ডাক্তার তোমাকে রেস্ট নিতে বলেছেন। এখন বেশি ঘোরাফেরা...চতুর্দিকে যা পলিউশন!

সুমনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ওরা দুজন গাড়িতে উঠলো। সরিৎ বললো— কোথায় যেতে চাও?

— এনি প্লেস, চলো বরং কাছাকাছি একটা বার-ফার এ যাই।

— তুমি একটু বেশি ড্রিংক করছো কিন্তু...

— আই নো হোয়াট আ অ্যাম ডুয়িং।

সরিৎ আর কিছু বললোনা। বালিগঞ্জ অঞ্চলেই একটা ছোট্ট বার-কাম রেস্তোরাঁয় ঢুকলো দুজনে। রঞ্জনের ভুরু কুঁচকে আছে। সরিৎ যে খুবই অস্বস্তিতে সেটাও স্পষ্ট। বিয়ারের অর্ডার দিয়ে দুজনে বসলো।

রঞ্জন বলে উঠলো— দ্যাট ওল্ড হ্যাগ। আমার বিয়ের খবর জানিয়ে চিঠি দিয়ে ছিলাম। লিখে পাঠিয়েছে আমার মুখ দেখতে চায় না, লেট দ্যাট ক্রিশ্চান গোল্ড-ডিগার গো টু হেল। সম্পত্তি থেকে ছেঁটে ফেলছে আমাকে। আ অ্যাম টেরিবলি আপসেট।

সরিৎ গ্লাসটা তুলে ধরলো, বললো— হার্ডলি এনি চিয়ার্স লেফ্‌ট দেন? কিন্তু রঞ্জন এটা তুমি গোড়ার থেকেই জানতে। জানতে না? তখন আমি তোমাকে বোঝাইনি? তুমি যেমন জেদি, উনিও তেমনি। তোমারই ঠাকুমা তো! তখন তুমি বলেছিলে তুমি কিছুর পরোয়া করো না। সম্পত্তিরও না।

গোমড়া মুখে রঞ্জন বললো— এদিকে আবার সুমনা কন্সিভ করে বসে আছে।

সরিৎ চমকে উঠলো, শুকনো গলায় বললো— একা একাই করল না কী!

— ওঃ তুমি এমন একেকটা কথা বলো না! অসুবিধেটা বোঝো!

— দেখো বিয়ে হলে সন্তান-সম্ভাবনা আছেই, না চাইলে প্ল্যান করে চলতে হয়। তা যখন করো নি কাঁদুনি গেয়ে তো লাভ নেই। অসুবিধেটা কিসের? টাকা পয়সার?

— সে তো আছেই।

সরিৎ বললো— সে না হয় আমি তোমাকে হেল্‌প করলাম। কিন্তু এত খরচের অভ্যেসটা তো তোমাকে এবার কমাতে হবে। তুমি এখন বিলিওনেয়ারেসের নাতি নও। একজন স্ট্রাগলিং এগজিকিউটিভ। আজকের প্রতিযোগিতার বাজারে তোমাকে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। তার ওপর তুমি এখন ফ্যামিলি ম্যান। লাইফ স্টাইল বদলাও।

— তোমার কথায়?— রঞ্জন ফুঁসে উঠলো— আমার পকেটমানি কত ছিল জানো?

সরিৎ একটু তপ্ত গলায় বললো— জেনে আমার কাজ নেই। এই জীবন তুমি নিজে বেছে নিয়েছো। তখন তোমার প্রচুর উৎসাহ দেখেছি, প্লেন্টি অব ডিটারমিনেশন। তোমার মতন একজন কোয়ালিফায়েড এবলবডিড ইয়াং ম্যান খাটবে নিজের আইডেনটিটি নিজে তৈরি করবে...এতে...

— সেভ ইট সরিৎ। রঞ্জন চাপা গলায় প্রায় ধমকে উঠলো— তোমার উপদেশ শুনতে ডাকিনি।

সরিৎ কড়া গলায় বললো— তাহলে কিসের জন্য ডেকেছো? মায়া-কান্না শোনাতে? একদম গোড়ার থেকে তোমায় বলে যাচ্ছি রঞ্জন ঠাকুমার প্রতি তোমার

অ্যাটিচ্যুডটা ঠিক না। আই হ্যাভ আসকড্ য়ু টু লীভ সুমনা অ্যালোন!

ধূর্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললো--- কোথায় তোমার কামড়াচ্ছে আমি জানি সরিৎ। ভেবো না আমি অত আহাম্মক। তবে ফর ইয়োর ইনফর্মেশন শী অ্যাপ্রোচ্ড় মি ফার্স্ট। পিটিফুল স্টেট। শী ওয়াজ ম্যাডলি ইন লাভ্ উইথ মি, অ্যান্ড আই টুক পিটি অন হার...

-- লায়ার। মিথ্যে কথা বলছো তুমি। ড্যামড্ চীপ লায়ার...

রঞ্জন একটা ঘুষি তুললো। সরিৎ হাতটা ধরে ফেললো। বললো— সুমনা সম্পর্কে আর একটাও মিথ্যে বাজে মন্তব্য যদি শুনি তোমায় আমি ছেড়ে দেবো না...মনে রেখো...চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়ালো সরিৎ। বেরিয়ে গেল। তার মুখ থমথম করছে।

শাকম্ভরীর দ্বীপ থেকে দ্বিতীয় চিঠি এসে পৌঁছলো রঞ্জনের বাড়ির ঠিকানায়।

চিঠিটাকে উল্টেপাল্টে অনেকবার আদর করলো সুমনা, ভাবলো খুলবে কিনা। নাঃ অন্যের চিঠি খোলা? ওটা সে পারবে না। রঞ্জন বাড়ি ফিরেছে, সুমনা চিঠিটা পেছনে লুকিয়ে হাসতে থাকে খানিকটা। খানিকটা বাড়াবাড়ির পর চিঠিটা হাতে পেলো রঞ্জন। ঠাকুমা এবারও রঞ্জনকে দ্বীপে যেতে লিখেছেন। কিন্তু শুধু তাকে। মুখটা তার থম থম করছে। সুমনা খুবই নিরাশ। এতদিনে তার মনে অভিমান জমছে। সে বললো-- ডেকেছেন। যাও।

— নো, নেভার। তোমাকে না ডাকলে যাবো না।

সুমনা বললো— শোনো রঞ্জন, আমি ব্যাপারটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে বুঝতে পারছি। তুমি গোঁয়ার্তুমি করো না। প্লিজ যাও। এভাবেই হয়তো একদিন উনি স্বাভাবিক হয়ে যাবেন।

না-না করে শেষ পর্যন্ত সুমনার জোরাজুরিতে গেল রঞ্জন। উইক-এন্ডটা কাটিয়ে ফিরলো। যেন অনেক নিশ্চিন্ত হয়ে। কিন্তু সুমনার আশা মিটল কই? ঠাকুমা তাকে গ্রহণ করতে এখনও অস্বীকার করেছেন। রঞ্জন বললো— আস্তে আস্তে চেঞ্জ করবে বুড়ি। শী ইজ আ হার্ড নাট টু ক্র্যাক। কিন্তু ওর সম্মতি আমি আদায় করবোই। ধীরে ...খুব ধীরে। আরেকটা চিঠি এল। তখন সুমনার বাচ্চা হওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে। রঞ্জন গেল, ফিরে এল। কিন্তু অফিসের জমা কাজ সামলাতে সে ভীষণ ব্যস্ত। সুমনার যখন মেয়ে হল, পুরো ব্যাপারটা সামলাতে হল সরিৎকে। সিজর হবে। কোথাও রঞ্জনের দেখা নেই, অবশেষে ফর্মে দাদা বলে সই করলো সে। নার্সের কাছে শুনতে হল বাচ্চা ঠিক মায়ের মতো সুন্দর হয়েছে। কিন্তু মামার আদলও নাকি স্পষ্ট বোঝা যায়।

সরিৎ চমকে বললো— নেভার স্পীক সাচ ননসেন্স। একটু পরেই বললো—

স্যরি সিস্টার। সিস্টার হেসে বললেন— আপনি অত রেগে গেলেন কেন বুঝলাম না। মামার মতো তো বাচ্চারা আকছার হয়।

হালকা গলায় সরিৎ বললো— এত ছোট্ট, আপনারা এসব মিলটিল বুঝতে পারেন?

সিস্টার বললেন— সমানে দেখছি। বুঝবো না? তবে ও কিন্তু দারুণ ফর্সা, একেবারে মেম সাহেবের মতো। আপনি তো নয়ই। ওর মা-ও অতটা ফর্সা নয়। এটা বোধহয় ওর বাবার জিন।

রঞ্জন কিন্তু বাচ্চাটাকে দেখেই বললো— এ তো বসানো রাজেশ্বরী ঠাকুরানী!

সাবধানে বাচ্চাটাকে ওর কোলে তুলে দিল সরিৎ। এই সময়ে সিস্টার এসে বললেন— বাচ্চাটাকে এখনই অত নাড়াঘাঁটা করবেন না প্লিজ। বাই দা ওয়ে মিঃ মুখার্জি আপনিই তো বাবা!

রঞ্জন বললো— অবভিয়াসলি।

সিস্টার নীরস গলায় বললেন— আমাদের খুব কনফিউশন হচ্ছিল। আসলেন একজন। অনন্যোপায় হয়ে সইও দিলেন। অথচ বাবা আরেকজন— আনরী চেবল। এরকম সাধারণত হয় না। তবে হ্যাঁ দাদারও একটা দায়িত্ব থাকে বই কি!

রঞ্জনের মুখটা অন্ধকার, সে বললো— হাউ দে টক! মানুষের কাজ থাকতে পারে না? সরিৎ গম্ভীর গলায় বললো— তুমি মোবাইলটা অফ রেখেছিলে কেন? ও বারবার তোমাকে চেষ্টা করেও পায়নি। নিজেই ব্যাগ নিয়ে একা হসপিট্যালে এসেছে। আবার ট্রাই করেছে। পায়নি। তখন আমাকে করেছে।

রঞ্জন হালকা গলায় বললো— আর বলো না। একটার পর একটা বাজে কল। বিরক্ত হয়ে সুইচ অফ করে দিলাম।

— কী করে দিলে রঞ্জন? তুমি জানতে না সুমনার টাইম...

— কৈফিয়ত চাইছো? কেমন একটা চাপা হুংকারের মতো করে বললো— রঞ্জন।

সরিৎ বললো— চাইতেই পারি। যে কাজটা তোমার করার ছিল সেটা আমাকে করতে হল কিনা। দেয়ার ওয়্যার লটস অব ফর্ম্যালিটিজ।

রঞ্জন হঠাৎ খুব উদারভাবে বলে উঠলো— কী জানো সরিৎ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিকই হয়েছে। তুমি যত এফিশিয়েন্টলি এ কাজগুলো পারবে, আমি কি ততটা পারতাম? মাই ওয়ার্ল্ড ইজ ডিফরেন্ট। এইসব কাঁথাকানি, ডায়াপার, বেবিফুড, ফীডিং...মিডলক্লাস গেরস্ত টাইপ...

এই সময়ে বেড-এর দিকে থেকে ক্ষীণ স্বর ভেসে আসে। সুমনা বলছে— তোমরা ঝগড়া করো না প্লি-জ। বলে আবার ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় সে।

সরিৎ বিরক্ত চোখ ফিরিয়ে নেয়।

৯

একেক সময়ে সুমনার কেমন অবাক লাগে। এই সেদিন সে ছিল একেবারে একলা। ত্রিসংসারে আর কেউ ছিল না। করুণাময় ঈশ্বর আর শূন্যতা কীভাবে ভরিয়ে দিলেন। আর বিশ্বাস হয় না ওই রোমাঞ্চকর পুরুষ তার স্বামী, মাখনের তালের মতো এই শিশু তার সন্তান। ইশ চাকরিটা যদি ছেড়ে দিতে পারা যেত! কী ভালো লাগে নিছক ঘর সংসার। নিজেকে ঝাঁকিয়ে বাস্তবে ফিরে আসতে হয় তাকে। চাকরি ছাড়া সম্ভব নাকি? রঞ্জনের একার আয়ে... তার ওপর সে কখন চাকরি ছাড়বে, কতদিন বসে থাকবে... ভীষণ খেয়ালী।

মেয়ে টুকটুক বড় হচ্ছে। সুমনা মেয়েকে নিয়ে মগ্ন। তার বেশি কিছু ভাবনাচিন্তা করবার তার সময় নেই। রঞ্জনের কাজ বাচ্চাটাকে আলগা আদর দেওয়া কিন্তু কাজের কাজ যা করবার তার জন্য সরিৎদাকেই ধরতে হয়। ইতিমধ্যে শাকম্ভরীর দ্বীপ থেকে চিঠি এসেছে। রাজেশ্বরীদেবী আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। রঞ্জন কালো মুখ করে চিঠিটা কুচিকুচি করে ছিঁড়েই ফেললো। আজকাল তার ভীষণ মেজাজ খারাপ হচ্ছে। আমন্ত্রণটা শুধু তার জন্য, সুমনার জন্য নয়। ধাক্কা খায় সুমনা, তবু সে জোর করে রঞ্জনকে পাঠায়। একটা মানুষ কতদিন তার শেকড় ছেড়ে থাকতে পারে! সে প্রতিদিন বোঝে রঞ্জন তার দ্বীপের জন্য ছটফট করছে। উইকএন্ড সুন্দরবনে কাটিয়ে রঞ্জন ফিরলে তার চোখেমুখে অন্য দীপ্তি দেখতে পাওয়া যায়। সে তখন বাচ্চাকে খুব আদর করে। সুমনাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়। বুকের ভেতরটা টনটন করতে থাকে তার। শুনে সরিৎ বলল— গুড নিউজ। যতই হোক ওঁর নাতি, উনি কখনও মাফ না করে থাকতে পারেন? যদিও মাফ করার মতো কাজ ও করেনি।

তার গলার স্বরে রুক্ষতা সুমনার ভালো লাগে না। সে হাসবার চেষ্টা করে বললো— খুব অন্যায় কিন্তু সরিৎদা। আমার সামনে আমার হাজব্যান্ডের নিন্দে করছো। আচ্ছা সরিৎদা রঞ্জন বলে তুমি নাকি জেলাস। কথাটা কি ঠিক?

সরিৎ বললো— জেলাস! রঞ্জন বলে বুঝি? তা তুমিও কি তাই মনে করো? জেলাস? ইনটারফিয়ারিং...আউটসাইডার...

সুমনা ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে গেল— ইশশ্ এমনভাবে বলছো সরিৎদা। একটু ঠাট্টাও করতে পারবো না তোমার সঙ্গে? তুমি আমার কতদিনের বন্ধু বলো তো! ছি ছি! তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে আমি...

সরিৎ চুপ। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো— সুমনা আজ চলি। একটা কথা। নিজেকে যদি ঠিক বুঝে থাকি তাহলে কোনকিছুই আমি ঠিক স্বার্থের জন্য করি না।

একটা দায়িত্ববোধ থেকে করি। কী করবো...এটাই আমার স্বভাব। এখন তুমি ঠিক করো আমাকে বিশ্বাস করবে কি না করবে। আমি কোনও অন্যায় সুযোগ নেবার চেষ্টা করছি কি না। ভেবেচিন্তে ঠিক করো তারপর তোমার কনক্লুশন জানিও, আমি...

তুমি কী? আর আসবে না?

সরিৎ বললো— ধরো তাই। ডাকলে আসবো। কিন্তু এই যে রঞ্জন আইল্যান্ডে গিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে আসছে। এই সময়টা একটা বাচ্চাকে নিয়ে তুমি কী করে কী করছো...আই ডোন্ট নো। যাক...আমার প্রতিদিন আসাটা ঠিক নয়। আমি বুঝতে পারছি।

সুমনার চোখে জল এসে গেছে— এ ভাবে বলো না সরিৎদা, তোমার কাছ থেকে আমরা শুধু নিয়েই যাচ্ছি, নিয়েই যাচ্ছি...বদলে কিছু দিতে...

সরিৎ কথা শেষ করতে দেয় না, বলে— বদলে আমার কিছু চাই, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট অপমান...

বলতে বলতেই বাচ্চাকে নিয়ে কাজের লোকটি ঢুকলো। বাচ্চা দু হাত বাড়িয়ে সরিতের কোলে ঝাঁপিয়ে চলে গেল।

সরিৎ বাচ্চাকে খুব আদর করলো। তারপর লোকটির কোলে ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেল। একবারও পেছন ফিরল না আর। বাচ্চা দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে তুমুল কাঁদছে। তবুও না।

এবার সুমনার একটু অস্বস্তি, ভাবনা শুরু হয়েছে। রঞ্জন প্রত্যেকবারই দ্বীপে যায় দ্বিধাগ্রস্ত মুখে, আসে উজ্জ্বল, উচ্ছল। কিন্তু আজকাল যাচ্ছে ঘন ঘন। এবং দেরি করছে। এভাবে চললে কি ওর চাকরিই থাকবে? তাছাড়া জীবনকে কি এভাবে দুভাগে ভাগ করে ফেলা যায়? একটার সঙ্গে আরেকটার কোনও যোগ নেই? সুযোগ পেলে সে রাজেশ্বরী দেবীকে দেখে নেবে। রঞ্জনের জন্যে প্রতীক্ষায় তিনটে সন্ধে কেটে গেল। শনি, রবি সোম, আজ মঙ্গলবার। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে। বাচ্চাকে ক্রেশ-এ দিয়েছে আজকাল।

এই সময়ে বেলটা বাজলো। দরজা খুলে দিল সে। রঞ্জন ঢুকলো কেমন বিধ্বস্ত, মুখে একটা ভীষণ অস্বস্তির ছাপ। কিন্তু সুমনা সেসব দেখেও দেখল না। ফিরে গিয়ে যে বইটা পড়ছিল, তুলে নিল।

রঞ্জন ডাকলো— সুমন!

— বলো।

— সুমন!

— শুনতে পাচ্ছি।

— রাগ করেছো?

সুমনা বললো— না রাগ করবো কেন? রাজকুমার সিন্ডারেল্লাকে বিয়ে করলেই

সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এ তো রূপকথা! বাস্তব অন্য কথা বলে, বলছে।

রঞ্জন বললো— স্বীকার করছি আমার দেরি হয়েছে। কিন্তু কারণটা জানো?

— বললাম তো রঞ্জন, শুনছি।

— সৌভিক হঠাৎ আত্মহত্যা করেছে।

সুমনার হাত থেকে বইটা পড়ে গেল।— সৌভিক? মানে তোমার মেজদা?

— ইয়েস।

— এই সেদিন বিয়ে হল না?

— হ্যাঁ ঠাকুমার বন্ধুর নাতনির সঙ্গে। খুব ভালো কাপ্‌ল। বিয়ের পরই আলমোড়া ঘুরে এল হানিমুনে। আমাদের বিয়ের ঠিক আগে।

সুমনা বললো— আচ্ছা, এই মেয়েটির সঙ্গে ঠাকুমা তোমার বিয়ে দিতে চেয়ে ছিলেন না?

— হ্যাঁ, আমি রিফিউজ করি।

— কেন রঞ্জন? কথাটা আমায় একটু বুঝিয়ে বলবে? তোমাদের দুই পরিবারের কতদিনের জানাশোনা, স্টেটাস এক। তাকে বিয়ে করাই তো তোমার পক্ষে ভালো ছিল। সুমনা বলছে বটে কিন্তু তার বুকের মধ্যে বিছের কামড়।

রঞ্জন বললো— আমার দাদা সুইসাইড করেছে আমি ভীষণ আপসেট। এখন তুমি এইসব বলছো?

সুমনা বললো— ঠিক আছে বলবো না? কিন্তু যাঁদের আমি দেখিনি, চিনি না যাঁরা আমার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার কী অনুভূতি তুমি আশা করো? তাঁরা বেঁচে আছেন কি নেই আমার কাছে কোনও তফাত নেই। কথাটা একটু কঠিন শোনাচ্ছে। কিন্তু এটাই সত্যি কথা।

রঞ্জন বললো— সুমন। আমরা মানে চার ভাই আরও কিছু কিছু ঠাকুমার পরিচিত বন্ধু বন্ধুকন্যার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি। তার মানে কি এই দাঁড়াবে যে ঠাকুমা জোর করে এর সঙ্গে ওর বিয়ে লাগিয়ে দেবেন?

— হয়তো মেয়েটির সঙ্গে তোমার কিছু আছে বুঝেছিলেন উনি।

রঞ্জন ঘুরে দাঁড়ালো— তেজস্বিনী? নো ওয়ে। অহঙ্কারে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য একটা মেয়ে। ওর সঙ্গে আমার মিলতো না, মিলতো না। মিলতো না। আই নেভার লাভড্‌ হার। অ্যান্ড আই ওয়ন্টেড টু ম্যারি আ উওম্যান আই লাভ, অ্যান্ড দ্যাটস্‌ য়ু।— সে ভীষণ আবেগে সুমনাকে জড়িয়ে ধরলো।

সেদিন রাতে সুমনা স্বপ্ন দেখে একটা রাজকীয় স্টীমারে করে সে শাকম্ভরীর দ্বীপে যাচ্ছে। রঞ্জনকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে আছে। নদীর জল কাটছে। শব্দ হচ্ছে জলের। স্টীমারের। দূরে একটা পথ। স্টীমারটা জল থেকে উঠে তার ওপর দিয়েই চলে যায়। একটা হুইল চেয়ার এগিয়ে আসছে। তার ওপর বসে লেডি রাণু মুখার্জি।

সে দু হাত জোড় করে নমস্কার করছে। হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাঘ গর্জন করে ওঠে, হুইল চেয়ার থেকে তার দিকে লাফ দিয়ে আসে একটা বিশাল বাঘ। চিৎকার করে উঠে বসে সুমনা। উঠে বসে রঞ্জন। কী হল? কী হল? এখনও বুক ধড়াস ধড়াস করছে। সুমনা কোনমতে বলে— বাঘিনী।

— স্বপ্ন দেখেছো? দূর পাগলি!— রঞ্জন তাকে জল খাওয়ায়। আদর করে। বলে ঘুমোও।

লাঞ্চের আগে রঞ্জন মন দিয়ে কাজ করছে। হঠাৎ মুখ তুলেই দেখে সরিৎ ঢুকছে। দেখেই রঞ্জন পাথর। সরিৎ ঘড়ি দেখে বললো— আধঘণ্টা আছে আর লাঞ্চ একসঙ্গে সারবো। আমি নিচে ওয়েট করছি।

বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না সে। রঞ্জন চেঁচিয়ে বললো— আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত। অনেক কাজ জমে গেছে। ওভারটাইম খাটতে হচ্ছে।

সরিৎ পেছন ফিরে বললো— তুমি আসছো, কথা আছে।

মিনিট পঁয়ত্রিশ বাদে লিন্ডসে স্ট্রিটের একটা ছোট নির্জন রেস্তোরাঁয় রঞ্জনকে নিয়ে ঢুকলো সরিৎ।

— কী ব্যাপার? বাদশাহি তলব!

জবাবে সরিৎ কাগজ খুললো। একটা খবর লাল কালিতে দাগিয়ে রেখেছে। দেখালো— পড়েছো নিশ্চয়।

রঞ্জন বললো— পড়িনি। কিন্তু ন্যাচার‍্যালি জানি। আমার মানসিক অবস্থা খুব খারাপ সরিৎ। আমার দাদার মৃত্যুসংবাদ দিতে আমাকে এখানে নাটকীয় ভাবে ডেকে আনার মানে কী?— মাথাটা নিচু করে সে দু হাতে রগ টিপে ধরলো।— ইটস হরিবল।

সরিৎ বললো— ব্যাপারটা কী করে ঘটলো! কেন?

— হাউ ডু আই নো? পুরোটাই আমার কাছে মিস্টরি।

— আর য়ু শিওর? সৌভিকদার স্ত্রী তেজস্বিনী, তার সঙ্গে তোমার দীর্ঘদিনের অ্যাফেয়ার তুমিই বলেছো রঞ্জন। তুমি কি ওখানে থিয়েটার রোডে ওদের সঙ্গে...

— ও নো। নো, আ থাউজন্ড টাইমস নো। শোনো সরিৎ— আমি যখন কাউকে ছাড়ি আর ফিরে তাকাই না। টেক ইট ফ্রম মি।

— তেজস্বিনী যদি তোমাকে ভুলতে না পেরে থাকে? তার ফ্রাসট্রেশন-এর জন্য যদি ওদের বনিবনা না হয়ে থাকে?

রঞ্জন এবার রাগত গলায় বললো— বাঃ তার জন্যে কি আমি দায়ী? সৌভিকেরও তো চয়েস ছিল। ও তো সব জেনেশুনেই ওই ডেঞ্জারাস মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল। কেন করতে গেল?

সরিৎ আশ্চর্য হয়ে বললো— ডেঞ্জারাস? মানে?

— ডেঞ্জারাস মানে সী হ্যাজ আ বিস্টলি টেম্পার। কোনও কিছু সহ্য করে না। অসম্ভব উদ্ধত। আই উডন'ট বি সারপ্রাইজড্ ইফ দে হ্যাড আ রো বিফোর সৌভিক...চোখদুটো লাল হয়ে গেল রঞ্জনের। সে মুখ ঢেকে বললো— হরিবল্, হরিবল। আই কানট ইভন থিংক অব ইট।

— সেদিন তুমি কোথায় ছিলে?

— আমি সেদিন বাড়ি ফেরার লঞ্চে— দ্বীপ থেকে। এনিওয়ে, দিস ইজ ডিসগাস্টিং। তুমি কি আমার জবানবন্দি নিচ্ছো?

সরিৎ বললো— অতবার অতদিন শাকম্ভরীতে যাবার, থাকবার দরকারই বা কী তোমার রঞ্জন?

— দ্যাখো সরিৎ, তুমি অনেকদিন থেকে আমার ওপর গার্জেনি করবার চেষ্টা করে যাচ্ছো। ঠিক করছো না। আমার অ্যাবসেন্সে তুমিই বা ঘনঘন আমার বাড়িতে যাও কেন? এগুলোও আমার জানা দরকার। আমার বাচ্চা আমার চেয়ে তোমাকে দেখলে বেশি খুশি হয়, কেন?

সরিতের মুখে একটু হাসি ফুটলো, বললো— লক্ষ্য করেছো তাহলে? যে বাবাকে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখে বাবাকে দেখে তার উৎসাহিত হবার কথা নয়। রূঢ় বাস্তব। যাক, জিনিসটা যে তোমার মনে দাগ কাটতে পেরেছে এতে আমি আশান্বিত।

গোঁয়ারের মতো রঞ্জন বললো— যখন-তখন আমার বাড়ি যাওয়া তোমায় বন্ধ করতে হবে।

সরিৎ বললো— তুমি খুব ভালো করে জানো...যাই না। কিন্তু তোমার বাচ্চার এনটারিক ফিভার, ভাইর‍্যাল ইত্যাদি হলে আমাকেই সামলাতে হয়। সেরে ওঠা বাচ্চার আবদারও আমাকেই মেটাতে হয়।

রঞ্জন বললো— ইনাফ। আমি এমন মেয়ে বিয়ে করেছি যে এসব সামলাতে পারে।

সরিৎ হেসে উঠল— ভালো। সে তার বাচ্চার সর্দিকাশি, ভ্যাকসিনেসন এনট্রিক ফিভার ব্লাড ডিসেন্ট্রি, চাকরি, ঘর সব একলা একলা সামলাবে আর তুমি তার সো-কলড্ হাজব্যান্ড সুন্দরবনে একটা আনরীচেবল দ্বীপে গিয়ে ঠাকুমার কোলে বসে চুষি কাঠি চুষবে।

রঞ্জন লাফিয়ে উঠলো— মাইন্ড ইয়োর ল্যানগুয়েজ সরিৎ। আমার যেখানে খুশি যাবো, যা খুশি করবো, রাজেশ্বরী ঠাকরুণকেও আমি ভালো করে সমঝে দিয়েছি তার গার্জেনগিরি আমার ওপর চলবে না। তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি।

সরিৎ শান্ত গলায় বললো— আমিও তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি তোমার স্ত্রী-কন্যার অযত্ন হয়, ক্ষতি হয়, তারা কষ্ট পায়— এমন কিছু তুমি করবে না। নইলে...

— নইলে কী?

— দেখতেই পাবে।

সরিৎ রেস্তোরাঁ ছেড়ে চলে গেল।

সেই রাগের রেশ নিয়েই বাড়ি ফিরলো রঞ্জন। সুমনা কিছু সাংসারিক কাজ করছে। বাচ্চা কাঁদছে। রঞ্জন কোলে তুলে নিতে আরও কেঁদে উঠলো।

সুমনা বললো— ও সরিৎদাকে মিস করছে। বুঝলে?

রঞ্জন বললো— তা ভালো তো! সরিৎদাই এ বাড়িতে থাক। আমি বরং অন্য কোথাও চলে যাই।

সুমনা খানিকটা থমকে গেল, তারপর থমথমে মুখে বললো— সব বিষয়ে সন্দেহবাতিক আমার ভালো লাগে না রঞ্জন। অনেকদিন বয়স হয়ে গেল তোমার এই জেলাসিটার। বাজে না বকে মেয়ের দিকে নজর দাও।

হঠাৎ মেজাজ পাল্টে গেল রঞ্জনের। সে বললো— জানো সুমন, আমার এই মেয়েটার সঙ্গে একটা লাভ-হেট রিলেশনশিপ আছে। যত বড় হচ্ছে তত ও রাজেশ্বরী ঠাকরুণের মতো দেখতে হচ্ছে। মে বি ও-ই হবে শাকম্ভরীর দ্বীপের নেক্সট্ রাজেশ্বরী। সুমনা চোখ বড় করে বললো— লাভ হেট রিলেশনশিপ? মেয়ের সঙ্গে?

— আহা ও যে আমার ঠাকুমার কথা মনে করিয়ে দেয়।

সুমনা বললো— এখন তো আর রাগারাগি নেই। দিব্যি তো গিয়ে আদর খেয়ে আসছো।

রঞ্জন কঠিন মুখে বললো— একবারও বুড়ি তোমার সম্পর্কে, বাচ্চা সম্পর্কে একটি কথা খরচ করে না। তোমার এই অপমানের শোধ আমি নেবো।

— আহ্ রঞ্জন ছাড়ো, এসব কথা আমার আর ভালো লাগে না।

রঞ্জন কথা কানেই নিল না।— প্রত্যেকবার চিঠি আসে আর ভাবি এবার বুঝি বললো। বাট শী ডাজন'ট। আমার একেকসময় মনে হয় আই ক্যান কিল হার ফর দিস।— মুখটা তার রাগে ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে।

সুমনা বললো— প্লিজ রঞ্জন ধৈর্য ধরো। সময় লাগবে। তবে হ্যাঁ, উনি আমাকে না ডাকলেও আমি এমন আছি, বেশ আছি।

— ভালো কথা। আমাকে আবার যেতে লিখেছে। চিঠিটা অফিসে এসেছিল। লাল চিঠিটা বার করতেই সুমনা হঠাৎ সেটা ছিনিয়ে নিল, বললো— দেখি কী লিখেছেন!

রঞ্জন বললো— প্লিজ, দেখো না, অন গড বলছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।

সুমনা চিঠিটা ফিরিয়ে দিল।— মাথা কাটা যায় তো যাও কেন?

রঞ্জন বললো— এখনও আশা ছাড়িনি। আমার ভাগ আমি পাবো না কেন? এই লাইফস্টাইল আমার সুট করে না। ডোন্ট মাইন্ড। এত ছোট জায়গায় এভাবে আমি

থাকিনি কখনও। একটা গাড়ি নেই। বাড়িতে একটা সেলার নেই। আমার স্ত্রী মিনি বাসে অফিস যায়। তোমাকে আজ অবধি আমি একটা দামি উপহার কিনে দিতে পারলাম না। এগুলো আমায় হন্ট করে। সব সময়ে।

সুমনা সামান্য হেসে বললো— আমি তো এ কথা তোমাকে অনেক অনেক আগেই বলেছিলাম প্রিন্স। তুমি পারবে না। তোমার ধাতে নেই। আমার কাছে এই-ই অনেক। স্বর্গ। কিন্তু তুমি...তুমি কী করে অভ্যেসের বাইরে যাবে। অত সহজ?

রঞ্জন কোমল গলায় বললো— আমি কি তোমায় কিছু বলেছি? অক্ষমতা তো আমারই। সেটাই আমাকে ক্ষেপিয়ে দেয়। আই লাভ য়ু। আমার বলবার কথা হল, যা আমার হক তা আমার বউ মেয়ে পাবে না কেন?

সুমনা কী রকম বিষণ্ণ গলায় বললো— কী জানি রঞ্জন। সব পেলে যদি আমাদের ভুলে যাও! বড় ভয় করে আজকাল। যতদিন তুমি ওই জায়গাটা থেকে না ফেরো, আমি প্রাণ হাতে করে বসে থাকি।— বলতে বলতে তার গলা ধরে এল।

রঞ্জন তার মাথাটা বুকে টেনে নিল, বললো— সুমন, তোমার হক ওই শাকম্ভরীর দ্বীপ থেকে আমি ছিনিয়ে আনবোই। সম্ভবত এবারই। জাস্ট হ্যাভ ফেথ ইন মি।

আষাঢ় মাসের এক বিকেলে সুমনা হঠাৎ ইন্টারকমে সরিৎকে ডাকলো। ডাকটায় কিছু ছিল। সরিৎ হাতের কাজ না সেরেই বেরিয়ে এল। সুমনার ঘর উল্টো দিকে। ঢুকে দেখে সে কাজ করছে না কিছু। গালে হাত দিয়ে শুকনো মুখে বসে আছে।

— কী ব্যাপার সুমনা? মেয়ে ঠিক আছে তো?

— হ্যাঁ। ক্রেশ-এ বেশ মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু...

— কিন্তু কী?

— রঞ্জন ফেরেনি এখনও।

— কত দিন?

— উইক এন্ডে গেল, আরেক উইক এন্ড পেরিয়ে গেল। একটা খবর না। কিছু না। সরিৎদা ও বোধহয় আমাদের ভুলে যাচ্ছে। বলতে বলতে তার চোখ উপছোতে লাগল।

— তোমার এমন মনে হবার কোনও কারণ আছে সুমনা?

— না, ও তো বলে ট্রাস্ট মি, হ্যাভ ফেথ ইন মি, তোমার হক আমি ছিনিয়ে আনবোই। আমি হক-টক বুঝি না সরিৎদা। ও থাকলেই আমি খুশি।

সরিৎ হালকা গলায় বললো— দূর, ও একটা খ্যাপা, তুমি ওর জন্যে ভেবো না। চাকরি টাকরি করা ওর ধাতে নেই। তিন বছরে দু বার পাল্টালো। তা ছাড়া...

— সরিৎদা আজ আমার সঙ্গে একটু বাড়ি যাবে?

— রঞ্জনের অনুপস্থিতিতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

সুমনার মনে পড়ে গেল সে সরিৎকে কিছু কড়া কথা শুনিয়েছে। ম্লান মুখে বললো— ডাকলেও আসবে না আর? টুকটুক বাড়ি ফিরেই তোমায় খোঁজে।

— কী করে বুঝলে?

— দাদা দাদা করে কাঁদে।

সরিতের মুখটা স্নেহের হাসিতে ভরে গেল। বললো— ডবল প্রোমোশন? কাকা মামা টপকে দাদা?

সুমনা বললো— দাদা মানে দাদু নয়, আমি সরিৎদা বলি, ও-ও ইৎ-দা ইৎ-দা বলে।

সরিৎ বললো— যাক আশ্বস্ত হলাম। চলো পুঁচকেটাকে দেখে আসা যাক।

সুমনার মন খারাপ। এতদিন রঞ্জন আসছে না সেটা একটা ভাবনা। রঞ্জনের চাকরির কোনও উন্নতি হচ্ছে না সেটাও আরেক ভাবনা। সরিৎ তাকে নানাভাবে আশ্বস্ত

করতে চেষ্টা করে। বলে--- অত বলিয়ে-কইয়ে ছেলে। চাকরিতে মন বসাতে ওর দেরি হচ্ছে। যখন উন্নতি হবে ওকে আর কেউ আটকাতে পারবে না। আসলে অন্যভাবে মানুষ তো। যা চেয়েছে সব চিরদিন পেয়ে গেছে। দায়িত্ববোধটা এখনও ঠিক আসেনি। খ্যাপাটেও বটে! সব ঠিক হয়ে যাবে। অত ভেবো না।

— সত্যি বলছো?

— না তো কী!

— যাক, আকাশ কালো করে আসছে সুমনা, সরিৎ বললো--- আজ উঠি। সাবধানে থেকো। সরিৎ চলে গেল। সুমনার মন থেকে যেন একটা বিশাল ভার নেবে গেছে। সে গান চালিয়ে দিল। মেয়ের সঙ্গে খুব খানিকটা হুল্লোড় করল। তারপর মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে গল্পের বই পড়তে লাগলো। আগাথা ক্রিস্টি। অনেক রাত বৃষ্টি নামছে দেখে জানলা বন্ধ করে সে শুয়ে পড়লো।

গভীর রাত। কোথায় কাদের জানলা খটাস খটাস করে পড়ছে। একটানা বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসের শব্দ। মাঝে মাঝেই সুমনার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, কোথাও যেন কে কার দরজায় প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায় সে, তারপর আবার শব্দে উঠে বসে। বেড সুইচটা টিপে দেয়। আলো জ্বলছে না। পাওয়ার কাট। এই সময়ে সে স্পষ্ট শুনতে পেল তাদেরই দরজায় ধাক্কা পড়ছে। কী করবে সুমনা? উঠে বসে সে কোনমতে একটা টর্চ হাতড়ায়। দরজার কাছে যায়। কান পাতে। সুমনা! সুমনা! তাহলে রঞ্জন ফিরলো? এই এত রাতে, দুর্যোগে। সে আইহোলে চোখ রাখে, হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকে ঝলসে ওঠে পরিচিত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সে দরজা খুলে দেয়— রঞ্জন! তুমি এত রাতে! তাড়াতাড়ি ঢুকে এসো।

রেনকোটের প্রান্ত থেকে জল ঝরছে, মাথার চুল বিস্রস্ত ভিজে। রঞ্জন অন্ধকারে ঢুকে আসে। বলে— আমি রঞ্জন নই! অর্জুন। রঞ্জনের ছোট ভাই।

হঠাৎ সুমনার কেমন শীত করতে থাকে। সে বিস্ফারিত চোখে শুধু চেয়ে থাকে। অর্জুন বলে— একটা খুব খারাপ খবর আছে। ম্যাডাম আপনি...মানে রঞ্জন, প্লিজ বি স্টেডি...রঞ্জন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। একেবারে হঠাৎ।

সুমনা টলছে। অর্জুন খেয়াল করছে না। বলে যাচ্ছে নেশাগ্রস্তর মতো। আপনার... জানা উচিত সবটা। বুঝলেন! ভালুকটিলা বলে একটা জায়গা আছে, ওখানে উঠলে নদী খুব ভালো দেখা যায়। আকাশও... প্রায়ই যেত। কীভাবে পা ফসকে নিচে পড়ে যায়। মানে কেউ জানেই না...ভীষণ কুমির... নো হেলপ্...।

সুমনা পড়ে যাচ্ছে। অর্জুন ধরে ফেলছে। ঘরের ভেতর এসে কৌচের ওপর শুইয়ে দিচ্ছে। বাইরের দরজা বন্ধ করল। এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁক দিল--- কেউ আছেন? কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ আলো চলে এল। সে দেখতে পেল সুমনার মোবাইল ফোন চার্জে বসানো আছে। তুলে নিয়ে স্টোরটা পরপর দেখে

যায়। সরিৎ বিশ্বাস। সরিৎ...সরিৎদা নাকি? সে বোতাম টেপে।

— হ্যালো!

— আমি অর্জুন বলছি।

— প্লিজ, কাল করবেন। এত রাতে...

— আমি রঞ্জনের ভাই অর্জুন বলছি—

সরিৎ বিছানায় উঠে বসলো। কানে মোবাইল।— কে বললেন?

— রঞ্জন নারায়ণের ভাই, জেভিয়ার্সের সরিৎদা তো আপনি?

— হাঁ।

— রঞ্জনের বন্ধু তো!

— হ্যাঁ।

— আমি অর্জুন। সরিৎদা রঞ্জন ইজ নো মোর।

— কী বললে?

— ইট ওয়জ আ ন্যাস্টি অ্যাকসিডেন্ট।

— কোথা থেকে বলছ?

— রঞ্জন-সুমনার বাড়ি থেকে। সুমনা সেন্সলেস হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছি না কী করবো।— পুরো সময়টা অর্জুনের গলা কাঁপছে।

— হাউ ডেয়ার য়ু? এই খবর নিয়ে সুমনার বাড়ি এত রাতে! তুমি কি মানুষ? মাই গড। ওহ মাই গড। আমি এক্ষুনি আসছি। দিস মোমেন্ট।

১১

স্মৃতিতে মগ্ন ছিল সুমনা। রঞ্জনের তথাকথিত মৃত্যুর পর তিনবছর কেটে গেল। সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না। মনে হয় যে কোনও মুহূর্তে রঞ্জনের বাইক গেটে এসে থামবে। কিংবা ট্যাক্সির ব্রিং আওয়াজটা হবে। বেল বাজবার আগেই দরজা খুলে দাঁড়াবে সুমনা। কিম্বা তার অফিস-আওয়ার শেষ হওয়ার মুখে কাঁচ-দরজা সজোরে ঠেলে ঢুকে আসবে রাজকুমার। হাসিতে বিজলি খেলছে। দুজনে চোখে চোখে চাইবে। বিদ্যুৎ বইবে, তারপর বাইকের পেছনে উঠে পড়বে সে। প্রথমে ক্রেশ। সেখান থেকে মেয়েকে তুলে সোজা বাড়ি। হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠে সে বাড়িতে, অফিসে, রাস্তায়। রঞ্জনের গলার আওয়াজ না! রঞ্জনের গায়ের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। নেই। নেই। নেই। সে তাকে শেষ দেখেছে এক শনিবারের সকালে। সুন্দরবন যাবে বলে বেরিয়ে যাচ্ছে। ইদানিং কোনও ওভারনাইট ব্যাগ-ট্যাগ নিত না। সবই ওর ওখানে আছে। হাসিমুখে উড়ন-চুমু ছুঁড়ে দিল। চলে যাচ্ছে। রঞ্জন চলে যাচ্ছে। সে জানত না চিরদিনের জন্য। তাই যেতে দিয়েছিল। যাবার ক্ষণটাকে আলাদা করে কিছু দেয়নি। ভালুক টিলা! তারা দেখতে দেখতে পা ফসকেছে! কুমির! ওহ, আই ডোন্ট বিলীভ ইট রঞ্জন, আই ডোন্ট বিলীভ ইট। কোনদিনও বিশ্বাস করবো না। সে দুহাতে মুখ ঢাকলো। কত দিন কেটে গেল টুকটুক কলকল করে কথা বলছে, নার্সারি স্কুলে যাচ্ছে। ওহ্ কতদিন! একেকবার মনে হয়— এই তো সেদিন! সেই প্রথম দেখা, লেক, রিচ হোটেল, অদ্ভুত পাগলের মতো বিয়ের প্রস্তাব, নাইটক্লাবে নাচ— রেজিস্ট্রি অফিস...এই তো সেদিন ঘটলো, এখনও ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে। ঘটেই যাচ্ছে। তারপরই মনে হয়, না। সে কত কত যুগ আগে ঘটেছিল। কিম্বা ঘটেইনি, সবই কল্পনা, স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্নের দাম চোকাতে হবে সারাজীবন ধরে। টুকটুক কোনদিন জানবে না এক স্বপ্নে দেখা রাজপুত্তুর তার বাবা ছিল।

পাঁচ পাঁচ দিন পর যখন সব শেষ, পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে সমস্ত নশ্বর চিহ্ন, তখন এসে খবর দিচ্ছে। কী? না দুঃসংবাদ দিতে কারো পা ওঠেনি। সেইজন্যে ঝড়ের রাতে প্রবল বৃষ্টি আর নিষ্প্রদীপ সময়টা বেছে নিয়েছিল, এতটাই বিবেচনা। রঞ্জনের বেচারা বিধবার জন্যে। রাজেশ্বরী আমি এতদূর থেকে টের পাচ্ছি এ তোমার কাজ। শেষবার রঞ্জন বলে গিয়েছিল— 'সুমন, তোমার হক আমি ছিনিয়ে আনবোই! এই জেদই কাল হল। কেন আমি তোমাকে যেতে দিলাম! একজন বৃদ্ধা, পিতামহী তিনি খুনী তাহলে। একটা পরিবারে এত অ্যাকসিডেন্ট সুইসাইড হয় কী করে? কে জানে ওই মহিলা এক রক্তপিশাচী উন্মাদিনী কিনা। নিজের কর্তৃত্বের মুঠি আলগা হয়ে যাচ্ছে

দেখলেই ওঁর করাল হাত নেমে আসে। অ্যাকসিডেন্ট হয়। সুইসাইড হয়। ডমিনেটিং, পজেসিভ, বাবা-মার অত সম্পত্তি। ভাই ছিল ভাগীদার, সে-ও নাকি জলে ডুবে মারা যায়। কে জানে সেই জলের তলায় কার হাত ছিল? কী ভয়ংকর! কী নৃশংস।

সরিৎদা না থাকলে?

সরিৎদা মাথায় জলের ছিটে দিচ্ছে। ওষুধ দিল। হাসপাতাল। ডাক্তার বলতেন— ইনি কি খান নাই অনেকদিন! এত ম্যালনিউট্রিশন।

বিষণ্ণ চোখে চেয়ে আছে সরিৎদা। সুমনার চোখে চোখ মিলল। সরিৎদার চোখে এত যন্ত্রণা। এত আকুলতা সে আগে কখনও দেখেনি। সুমনা আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

সরিৎদা। তোমার মন এখন আমি বুঝি। জলের মতো স্বচ্ছ দেখতে পাই। তুমি না থাকলে টুকটুকের কী হত? দিনের পর দিন এসেছ, গেছ, টুকটুককে কখনও কনভেন্টে, কখনও নিজের বাড়িতে রেখে অঢেল যত্ন, আদর দিয়েছ, আজ আমাকে সুস্থ করতে প্রাণপণ করেছো। তোমার কাছে অশেষ ঋণ আমার। কিন্তু আমি যে পারি না। পারবো না। রঞ্জনের কাছে এখনও আমার মন, প্রাণ, শরীর সব গচ্ছিত আছে। তার জায়গায় আর কাউকে? না। আমি নিরুপায় সরিৎদা!...অথচ কী ভাবে, কোন হিসেবে তোমার এত সাহায্য নেবো! কোন মুখে? টুকটুক দাদা ছাড়া জানে না। তার চার বছর বয়সে সে সরিৎ ছাড়া আর কোনও পুরুষ মানুষের স্নেহ, ভালোবাসা, আদর পায়নি। আর তুমি? তুমি সুমনা? সে নিজেকে প্রশ্ন করে। আমিও তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না। জীবনে কোথাও যদি নিঃশর্ত স্নেহ আর ভরসার জায়গা থাকে সে সরিৎদা। এখনও বেঁচে থাকবার প্রেরণা পাই। মেয়েকে বড় করে তোলার জোর পাই। কিন্তু আমি যে একেবারে নিরুপায়।

সে বারবার তার ফটো অ্যালবামগুলো দেখে। রঞ্জনের ছবি, তার ছবি, দুজনের ছবি। আশ্চর্য। একমাত্র বিয়ের পর স্টুডিওয় তোলা পোশাকি ফটোটা ছাড়া আর সর্বত্র সরিৎ রয়ে গেছে। হয় পাশে, নয় পেছনে, অস্পষ্ট। কিন্তু আছে। আর না হয় স্রেফ কাটা পড়ে গেছে। ভাগ্য যেন তাকে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

অফিস থেকে ফিরে চান সেরে জামাকাপড় বদলে এলো সুমনা। মিনতি ওকে চা দিল।

— ঠিক আছে মিনতি এবার তুমি টুকটুককে নিয়ে একটু বেড়িয়ে এসো।

— হ্যাঁ দিদি। ছটফট করছে বেবি, পার্কে কত বন্ধু হয়েছে।

— শোনো, তুমি কিন্তু গল্পে জমে যাবে না। খেয়াল রাখবে। দূরে যেতে দেবে না।

— বেবিকে ছেড়ে আমি কোথাও যাই না দিদি।

মিনতি চলে যাচ্ছে হঠাৎ পেছন ফিরে বললো— তোমার একটা জরুরি চিঠি এসেছে দিদি। কুরিয়ার দিয়ে গেল। বইয়ের তাকে রেখে দিয়েছি।

চায়ে খুব আস্তে চুমুক দিচ্ছে সুমনা। অন্যমনস্ক। সে যখন হাসপাতালে, তখন সরিৎ— ওর প্রিয়নাথ মুখার্জির ফ্ল্যাট ছেড়ে দেয়। ফার্ন রোডের এক শান্ত পাড়ার দোতলায় এখন থাকে সে। ও বাড়ির একটা ফার্নিচারও এখানে আনেনি সরিৎ। জিজ্ঞেস করলে বলে— বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছিল, বাড়িঅলা ওগুলো ছাড়েনি। সুমনা বিশ্বাস করে না। সবই চুকিয়ে দিতে পারলো আসবাবগুলো আর পারলো না? আসল কথা, ওইসব স্মৃতিজড়িত জিনিস সুমনাকে প্রতিমুহূর্তে কষ্ট দেবে তাই, তাই এ বাড়িতে নতুন খাট, নতুন সোফা-কৌচ, নতুন ওয়ল ক্যাবিনেট, একটা কাপ-প্লেট পর্যন্ত নেই, যেটা ওখানকার। গোড়ার দিকে সুমনা লক্ষ্য করেনি। কিছুদিন সে তো মাদারের আশ্রয়ে ছিল। তখনই একটি একটি করে সব গুছিয়েছে সরিৎদা, তার দিদিকে নিয়ে। সে যখন এলো, একটা ঝকঝকে নতুন বাড়িতে। নতুন চাদর, নতুন পর্দা, নতুন বাসনপত্র। যখন খেয়াল হল— এটা কোথায় গেল, ওটা কেন? ওই এক কথা। বাড়িঅলা দেয়নি। কী করব বলো? সব বাদ দিলেও তো ফটো থেকে যায়, জামাকাপড় থেকে যায়। বাড়ি এসে সে একদিন ওয়ার্ডরোব খুলে রঞ্জনের জামাকাপড়গুলো গুছোবার নাম করে তার মধ্যে বুঁদ হয়ে বসেছিল। কখন সরিৎ এসেছে টের পায়নি। সেইদিন সরিৎদা তাকে বড্ড বকেছিল। কথাগুলো এখনও কানে বাজে তার— সুমনা, দুঃখটা সত্যি, অস্বীকার করছি না। কিন্তু তোমার এটা দুঃখবিলাস। পাছে দুঃখ তোমায় ছেড়ে চলে যায় তাই চারদিকে স্মৃতি ছড়িয়ে বসেছো। তুমি একটা ছাব্বিশ বছরের মেয়ে, পুরো জীবন তোমার সামনে পড়ে রয়েছে, সামনে রয়েছে চার বছরের একটা শিশু। তোমার দায়িত্ব নেই বাচ্চার প্রতি? নিজের প্রতি? কোনও কর্তব্যের কথা তোমার মাদার বা সিস্টাররা বলেননি? এ কী অসুস্থ মনোবিকার? তুমি একটা প্রাণ শক্তিতে ভরপুর, সাহসী, স্পোর্টস উওম্যান ছিলে, কত সহজে উঁচুতে উঠে যাচ্ছিলে। এই কি তোমার মৃত্যু নিয়ে অবসাদগ্রস্ত হবার সময়? আমরা জীবন পাই হয়ত বা একবার মাত্র সেই জীবনকে এইভাবে বাজে খরচ করছো?

এতসব কড়া কথা সরিৎদা আর কখনও তাকে বলে নি। সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে লজ্জা পেয়েছিল। সত্যিই তো। একটা প্রাণকে সে এত ভালোবেসে পৃথিবীতে এনেছে। সে কি এমনি অবহেলা করবার জন্য? তা ছাড়াও একটা গোপন সংকল্প তার আছে। যদি সুযোগ পায়, এতটুকুও সুযোগ, সে রঞ্জনের মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে চায়। খুনীকে শুধু দাগিয়ে দেওয়া। শাস্তি চাই না। অশীতিপর এক বৃদ্ধাকে সে কী শাস্তি দেবে? আদালতের বাইরে, সমস্ত প্রিয়জন, প্রজা, দাস-দাসীদের সামনে তাঁকে খুনী বলে শনাক্ত করবে সে। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহও হয়, সত্যিই কি উনিই অপরাধী। আরও এতজন ওদের পরিবারে, আর কেউ যদি?...এই

কথাটাই সে সরিৎকে একদিন বলে ফেলে।

সরিৎ আশ্চর্য হয়ে বলেছিল— তুমি কি পাগল হলে সুমনা? রাজেশ্বরী দেবীকে তুমি কতটুকু চেনো? তার চেয়ে বেশি চেনো না রঞ্জনকে? কী অসম্ভব বেপরোয়া ছিল ও! কীভাবে বাইক চালাতো? মনে নেই? কীভাবে আমার গাড়ি আর গাড়িশুদ্ধু মানুষগুলো নিয়ে ও ছিনিমিনি খেলতো! সুমনা, ওইরকম দস্যি বেপরোয়া হলে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। এটা মেনে নাও। ওকে খুন করে কার কী লাভ? এ সব ভেবো না।

আর কোনদিন এটা উচ্চারণ করে নি সে সরিতের সামনে। কিন্তু ভেতরের সন্দেহ যায়নি, যদিও সংকল্প মিইয়ে এসেছিল। কীভাবে এগোবে? এগোনোর সব পথই যে বন্ধ!

তাক থেকে চিঠিটা তুলতে গিয়ে যেন সাপের ছোবল খেল সে। খুনখারাপি রঙের একটা আয়তাকার বড় মোটা হ্যান্ডমেড পেপারের শৌখিন খাম। তার কোণে সোনালি মনোগ্রাম। টাইপ করা ঠিকানা। আস্তে আস্তে চিঠিটা খুললো সে। দামি হাতির দাঁতের রং হ্যান্ডমেন্ড পেপার। এক কোণে লেখা রাজেশ্বরী দেবী, শাকম্ভরীর দ্বীপ, সুন্দরবন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

চিঠির বয়ান এইরকম,

কল্যাণীয়া সুমনা,

আগানী ১২ জুলাই আমার আশি বৎসর পূর্ণ হবে। তদুপলক্ষ্যে আমার প্রিয়জনরা সব কয়েকদিন আমার কাছে আসবে। আমি আমার রঞ্জনের স্ত্রীকে, কন্যাকে দেখতে চাই। হয়তো এই আমার শেষ আমন্ত্রণ। আশা করি মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধার একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করবে না। তোমার জন্য ফেরিঘাটে লোক থাকবে। ৯ই জুলাই তারিখে দুপুর একটার সময়ে ক্যানিং থেকে লঞ্চ নেবে, তাতেও লেখা থাকবে দ্বীপের নাম।

ইতি,
রাজেশ্বরী দেবী
শাকম্ভরীর দ্বীপ

সঙ্গে পথের একটি ছোট মানচিত্র। চিঠির হাতের লেখা একজনের। স্বাক্ষর আলাদা লোকের। কৌণিক, বড় এবং জড়ানো, ভালো করে বোঝা যায় না।

চিঠিটা হাতে করে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুমনা। এই আমার শেষ আমন্ত্রণ? যেন অনেক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ছিল! কিন্তু এই সেই বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ। ভেবেছিল পাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেলো। ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন। এখন শোক সুমনার হৃদয়ের মধ্যে একটা অচঞ্চল পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকে। কিন্তু সে নিজের

বাইকে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে গিয়ে অফিসে যায়। তাদের হোটেল এখন আরও বড় হয়ে গেছে। বিশাল হলে যদি কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে তার জন্য সবরকম যোগাযোগ ও আপ্যায়ন ব্যবস্থা তাকেই করতে হয়। সরিৎ এখনও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। কিন্তু আসলে ম্যানেজার সেই-ই। যে শিল্পপতির নাম ম্যানেজার হিসেবে আছে তিনি আরও নানান ব্যবসায় ব্যস্ত। হোটেলের চূড়ান্ত দায়দায়িত্ব সরিৎ বিশ্বাসের। এখন সুমনার কোনও য়ুনিফর্ম নেই। সে সাধারণত পুরোদস্তুর শার্ট প্যান্ট টাই পরে অফিস যায়। কোনও অনুষ্ঠান থাকলে শাড়ি বা ড্রেস। তার চেহারার মধ্যে সেই ছেলেমানুষি হয়ত আর নেই। কিন্তু বোঝা যায় এই তরুণী মেয়েটি অনেক দায়িত্ব পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এই চেহারাতেই সে সরিতের মুখোমুখি হয় পরদিন সন্ধেবেলায়।

চিঠিটা উল্টে পাল্টে দেখে একেবারে নিস্পৃহভাবে সেটাকে টেবিলের ওপর রাখে সরিৎ। বলে— টুকটুকের যাবার প্রশ্নই নেই। তুমিও যাচ্ছো না।

সুমনা জেদি গলায় বললো— কেন?

সরিৎ পায়চারি করতে থাকে। যেন যা বলবে ভেবে নিচ্ছে বা বলবার শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে। একটু পরে দাঁড়িয়ে অদূরে সুমনার দিকে সোজা তাকিয়ে বললো— ওই ব্ল্যাক চ্যাপ্টারটা তুমি ভুলে যেতে পারো না সুমনা? মনে করো না ওসব কিছু ঘটেনি।

সুমনা কড়া গলায় বললো— কোনটা ব্ল্যাক চ্যাপ্টার সরিৎদা? রঞ্জনের অপঘাত মৃত্যুটা? না রঞ্জনের সঙ্গে আমার জীবনের পুরোটাই? সবটাকেই বোধহয় তুমি ব্ল্যাক বলতে চাইছো!

সরিৎ থমকে গেল।

সুমনার গলায় এবার রাগ এসে গেছে। সে বললো— বলো, চুপ কেন? আমি জানি, আমাকে জানতে হয়েছে রঞ্জনকে তুমি কোনদিন পছন্দ করেনি। হতে পারে সে একটু অন্যধরনের ছিল। অসাধারণ! তাকে আমাদের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু সে আমার জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। সে সময়টা ব্ল্যাক— আমিই বা ভাববো কী করে, আর তুমিই বা তা বলো কোন প্রাণে?

সরিৎ বিবর্ণ হয়ে যায়। যেন প্রতিটি কথা তাকে কুঁকড়ে দিচ্ছে।

অবশেষে সে আস্তে আস্তে বললো— তুমি যে রঞ্জনকে দেখেছো সে তোমারই রঞ্জন সুমনা। সেখানে কোনও কালো নেই। কিন্তু ওই দ্বীপ, ওদের পরিবার এ সমস্তই তোমার জীবনে দুর্দৈব নিয়ে এসেছে। এখন রঞ্জনকে তো আর ফিরে পাবে না। আমার মনে হয় ওদের সংস্রব তুমি ত্যাগ করো সুমনা। ওরা তো তোমায় চায়নি।

সুমনা বললো— তোমার মনে হয়, কিন্তু আমার তা মনে হচ্ছে না সরিৎদা। মনে হচ্ছে সেটা সত্য থেকে পালানো। টুকটুক রঞ্জনের পরিবারের অংশ। যদি বড় হয়ে

কোনদিন বলে আমার বাবার পরিবারের থেকে আমার দূরে রেখেছিলে কেন? কেন লুকিয়েছিলে? কী জবাব দেবো তখন? তাছাড়াও, এ রহস্য আমায় ভেদ করতে হবে। রঞ্জনের খুনী কে— জানতে হবে। এটা রঞ্জনের প্রতি আমার কর্তব্য। এ-ও ভাবো। চাননি আগে। কিন্তু এখন চাইছেন। এর কারণই বা কী? এ রহস্যও না জানা অবধি আমার শান্তি নেই।

১২

অতএব মাতলা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। দুজনেই জিনস্-এর ওপর পাঞ্জাবী। কাঁধে ব্যাগ। ক্যানিং। না 'শাকম্ভরীর দ্বীপ' লেখা কোনও স্পেশ্যাল লঞ্চ হাজির নেই। সোনাখালি, সোনাখালি— ভটভটিঅলারা হাঁকছে। গোসাবা চলুন, গোসাবা সেন্টার করে সুন্দরবন দেখে নিবেন আজ্ঞে— পাখিরালয়, সজনেখালি...চলেন, চলেন।'

সরিৎ বললো— শাকম্ভরীর দ্বীপ জানো মাঝি?

— জানবো না কেন? পেরাইভেট দ্বীপ। রানিমা থাকেন। ওঁদের আলাদা লঞ্চ সার্ভিস।

— এখানে থাকার কথা ছিল, নেই।

— তালে তো মুশকিল!

সরিৎ বললো— দেখছো তো সুমনা! চলো ফিরে যাই।

সুমনা বললো— আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো— এই মাঝি, শোনো। শোনো।

একটা বড় ভটভটি হাঁকছিল— শাকম্ভরী পেরিয়ে পীরখালি সাতজেলিয়া যাবো গো।

সুমনা দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরলো— শাকম্ভরী চেনো? নামিয়ে দিতে পারবে?

লোকটি বললো— তা পারবো, একটু উজানে যেতে হবে দিদি, ডবল ভাড়া চাই।

— দেবো।— সরিৎদা তুমি এখান থেকে ফিরে যাও। তুমি নিমন্ত্রিত নও এটা মনে রেখো। বলতে বলতে সুমনা তার অ্যাথলিট পায়ে ভর করে চকিতের মধ্যে ভটভটিতে উঠে গেল।

সরিৎ তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো সুমনার কথাগুলো— আমি প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বড় হয়েছি সরিৎদা, আমার ওপর একটু বিশ্বাস রাখো।

— ওখানে মোবাইল কাজ করবে না সুমনা, হঠাৎ কোনও বিপদে পড়লে...

— কী ধরনের বিপদে পড়লে কী করতে হয় সে জ্ঞান আমার আছে। অতটা বোকা, অসহায় আমি নই। তুমি যাবে না ফর দা সিম্পল রীজন তোমায় ওঁরা ডাকেন নি। ডাকেননি বলেই রঞ্জন বরাবর একা গেছে। ওর প্রেসটিজ সেন্স ছিল ভীষণ স্ট্রং। তোমারও প্রেসটিজ যায় এমন কিছু তুমি করবে না। বিলীভ মি। আমি পারবো।

ভুটভুটি এগিয়ে যাচ্ছে। সুমনা হাত নাড়ছে, মুখে নির্ভীক হাসি। সরিতের চোখে অপার দুর্ভাবনা। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো। ভুটভুটি মিলিয়ে যেতেই হঠাৎ যেন তার শরীরে একটা তৎপরতার জোয়ার এলো। সে লাফিয়ে পড়ে থাকা জালের স্তূপ পার হয়ে

গেলো। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমাতে জমাতে চললো। বেশ হাসি মশকরা করছে। সূর্য হেলে যাচ্ছে, সরিতের পাবলিক রিলেশন আর শেষ হচ্ছে না।

নদী ক্রমে বিস্তৃত হয়। এপার ওপার কতদূর! ভুটভুটিতে নানারকম যাত্রী। সবাই স্থানীয় গ্রাম্য বাসিন্দা।

একজন বললো— শাকম্ভরী চললেন? তো রানীমার সঙ্গে আগে কথা কয়ে নেন নি? ওঁর লঞ্চো আসে তো!

সুমনা বললো— কথা তো ছিল। কিন্তু আসেনি কেন তা তো আমি বলতে পারবো না।

— উনি খুব বড় রানী, আপনি যান কেন? ট্যুরিস্ট?

সুমনা জিজ্ঞেস করে— ট্যুরিস্ট যায়?

— যায় বই কি কখনও সখনও। মন্দির আছে, টিলা আছে, রানীর প্রাসাদ দেখবার মতো। অট্টালিকা একেবারে। মিষ্টি জলের পুকুর আছে। মিষ্টি মাটি নিয়ে গিয়ে কত রকম গাছ গাছালি করেছেন। আবার আমাদের বাদাবনের গাছপালাও আছে। যেন এক বটানিক উদ্যান দিদি। আপনি কেন যান দিদি?

প্রশ্নটা এরা কিছুতেই ভোলে না?

— একটা রিসার্চের কাজে যাচ্ছি। বনজঙ্গলের মন্দির নিয়ে, রিসার্চ বোঝেন তো?

— দেখেই বুঝেচি। রিসার্চ বুঝি বইকি! ওখানের যে শাকম্বরীর দেউল আছে। লোকে তো বলে তিনশ চারশ বছরের পুরাতন। উনি যেমনটি তেমন রেখেচেন।

সুমনা বললো— জায়গাটা কেমন, মানুষগুলো কেমন কিছুই জানিনা অবশ্য।

— কী জানেন? ওনারা হলেন বড়লোক রাজারাজড়া। আমাদের মতো গরিবগুরবোর সঙ্গে কারবার নাই। এদিকে বাদাবনেও ওঁদের প্রচুর জায়গা। প্রজা আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে নিলে ভালো করতেন।

— জন্তু জানোয়ার আছে?

— আছে তবে ও-ই শেয়াল, হরিণ, খরগোশ, কাঁটাচুয়ো এইসব। ওদের পোষা ভালুক আছে শুনেছি।

অন্য একজন বললো— পাড়ের দিকটা খুব খতরনাক দিদি। কুমির উঠে কেঠো গুঁড়ির মতো পড়ে থাকে। মওকা পেলেই শিকার নিয়ে সড়াৎ।

সুমনা শিউরে উঠলো।

—- দিদি ভয় পাবেন না। খবর যখন পেয়েছেন, ব্যবস্থা ওঁরা ঠিক করবেন। আর আপনি উঠবেন বাঁধানো ঘাট দিয়ে, দুধারে মোটা তারের জালি, তার ভেতর কুমির আসতে পারে না।

আরেকজন বললো— খুব আদর-যত্ন করবে। হোটেলের মতো। রানীমার নাম বইয়ে উঠলে তো আরোই করবে।

বিকেল। মাতলার জলে বিস্তৃত বিকেল। শাকম্ভরীর দ্বীপের বাঁধানো ঘাটে ভুটভুটি তাকে নামিয়ে দিলো। পাথর বাঁধানো শক্তপোক্ত ঘাট ঢালু হয়ে ওপরে উঠে গেছে। একটু পরে সিঁড়ি, দুধারে সত্যিই তারের শক্ত জাল, লাল রং করা। সে কোথাও কোনও জনমানবের চিহ্ন দেখলো না। ভুটভুটি তাকে নামিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। ঘাট থেকে এগিয়ে দুপাশে গাছে ঢাকা বনপথ। সুমনা কাঁধে ব্যাগ হাঁ করে দাঁড়িয়ে। সে কিছুটা চলে, আবার দাঁড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলো দূরে একটি লোক, চাষী গোছের। তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। হাত দেখালো ডানদিকে, ডাইনে গিয়ে বাঁয়ে।

তাহলে মহিলা ধাপ্পাবাজ! কী উদ্দেশ্যে তাকে এখানে ডেকেছেন! শুধু অপমান করতে? না রঞ্জনের স্ত্রী ও মেয়েকেও খুন করতে! ভাগ্যিস সে টুকটুককে সঙ্গে আনে নি। ভাগ্যিস সরিৎদার কথা শুনেছিল! অবশ্য, সুন্দরবনের গহনে একটা অজ্ঞাতপরিচয় জায়গায় একটা বাচ্চাকে নিয়ে একা আসা যে উচিত না, সেটা সে-ও বুঝেছিল। কিন্তু ওই 'মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধার একান্ত অনুরোধ' আর 'রঞ্জনের স্ত্রী ও মেয়ে' এই শব্দগুলো তাকে দ্রব করেছিল। টুকটুক ওঁদের বংশধর রঞ্জনের স্ত্রীর জন্য না হোক বংশধরের জন্য মানুষের মনে একটা আলাদা জায়গা থাকে। ঠিক আছে। দিন ধাপ্পা, করুন অপমান, তার জবাব সে দিতে পারবে, চেষ্টা করুন খুন করাতে, দেখা যাক কে জেতে! সে এর শেষ দেখে ছাড়বে।

মনস্থির করে সে ডান দিকের পথ ধরে বেশ খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে তাকাতেই দেখে মোরাম ঢাকা পথ চলে গেছে, দু পাশে কোনও অচেনা গুল্মের বেড়া এবং তার ওদিকে আলো করা ফুলবাগান, লন, সে পথ শেষ হয়েছে একটা লাল ইঁটের বিরাট বাড়িতে। দুপাশে দেবদারু মাঝে লম্বা চওড়া তিন পাট মেহগনি পালিশ দরজা। কোনও বেল সে দেখতে পেল না। বিরাট বিরাট পেতলের কড়া আছে। তাই তো, এখানে তো বিজলি থাকবে না। কড়া নাড়ছে, হঠাৎ বিকট ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল দরজা, অথচ কেউ নেই। লক্ষ্য করে দেখল ছিটকিনি থেকে একটা দড়িমতো কী চলে গেছে ওপর দিকে। তার সামনে অনেকটা চৌকো দালান, তারপর সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে এতক্ষণে উর্দিপরা একটি লোক নেমে আসে, হাত বাড়িয়ে দেয়। সুমনা তার ব্যাগ থেকে চিঠিটা বার করে দেয়। দেখে নিয়ে লোকটি ওপরের দিকে আঙুল দেখায়, নিচু হয়ে আপ্যায়নের ভঙ্গি করে। ব্যাপার কী? কথা বলে না কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে সে, পালিশ করা কাঠের সিঁড়ি। মাঝখান দিয়ে কার্পেট পাতা। উঠতে উঠতে প্রথম ল্যান্ডিং। হরিণের শিং শুদ্ধু মাথা। দ্বিতীয় ল্যান্ডিং— মুণ্ডুশুদ্ধু একটা গোটা বাঘের চামড়া ছড়িয়ে আছে দেয়াল জুড়ে। এদের সেই পুরনো কালের ধ্যানধারণা। জমিদার হলেই শিকার করতে হবে, হরিণ, হাতি, বাঘ। শিকারগুলো করেছে কে? রঞ্জন? না, রাজেশ্বরী দেবী স্বয়ং?

দোতলায় তখন আধো-ছায়া। চওড়া করিডর চলে গেছে, দূরে একটা গ্রিল দেওয়া

চারপাটের জানলা। সুমনা চমকে উঠলো, জানলার মাথার দেয়ালে একটা বিরাট মুখোশ। মাসাই যোদ্ধা। মাথায় নানারঙের পালক গোঁজা মুকুটের মতো। এরই ছোট সংস্করণ সে একদিন কিনেছিল ঘর সাজাবার জন্যে এবং রঞ্জনের ভীষণ তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এইজন্য?

দুপাশে চকচকে পালিশ করা সব বন্ধ দরজা। করিডরের দেয়ালে ছবি, ছবি, সে চিনতে পারে অবনীন্দ্রনাথ, অতুল বসু, নন্দলাল, গগ্যাঁ, ভ্যান গখ, রেমব্রান্টও... গাছও রয়েছে। চিত্রবিচিত্র পাতাবাহার, পাম। এসব এখানকার গাছ নয়। নিচের দেবদারুও নয়। মুখটা তার এবারে রাগে লাল হয়ে যাচ্ছে। ভুরু কুঁচকোনো, পিকচার গ্যালারি বা ফুলের বাগান দেখতে সে এখানে আসেনি।

এই সময়ে দূরের একটা দরজা খুলে গেল। জানলায় গোধূলি, খোলা দরজা দিয়ে গোধূলির দিকে পেছন করে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এল। আগাগোড়া কালো পোশাক। শাড়ি ব্লাউজ। হাতে কালো বালা, কানে কালো টপ। চুলগুলো খুব উঁচুতে গুচ্ছ করে বাঁধা। তাকে দেখে ভাবলেশহীন মুখে এগিয়ে এলো যুবতীটি।

— আপনি?

— সুমনা মুখার্জি— রাজেশ্বরী দেবীর চিঠিটা তার হাতে ধরাই ছিল।

— একটু পেছিয়ে যান, রুম নাম্বার থ্রি। সব রেডি আছে। ...একবার তার মুখের দিকে তাকালো তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই চলে গেল পেনসিল হিলের খটখট আওয়াজ তুলে।

অপমান নাম্বার থ্রি।— সুমনা আপনমনেই বললো।

তিন নম্বর ঘরের দরজায় চাবি ঝুলছে। খুলতেই একখানা চমৎকার ঘর ভেসে উঠলো। একটা ভালো হোটেলে যা যা সুবিধে থাকে, সেসব তো আছে বটেই। কিন্তু তার সঙ্গে বনেদিয়ানা। কারুকাজ করা খাট, ক্যাবিনেট, দোল চেয়ার, গদীমোড়া সোফা। দেয়ালে একটিমাত্র ছবি। হাতে আঁকা স্কেচ— রঞ্জন। অনেকদিন পরে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল সুমনা। সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠলো ইলেকট্রিক আলো। দরজায় নক। সে নিজেকে সামলে খুললো। উর্দিপরা একটি লোক। হয়তো সেই লোকটাই। হাতে একটা রুপোর ট্রেতে কার্ড। লেখা— শাকম্ভরীর দ্বীপে স্বাগত। রাজেশ্বরী দেবীর অনুরোধ, ১৪ নং ঘরে তিনি এখনই মিসেস রঞ্জননারায়ণ মুখার্জি ও মিস রঞ্জন নারায়ণ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

লোকটি দাঁড়িয়ে রইলো। তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরোল সে। লোকটি ঘরে চাবি দিয়ে চাবিটা সুমনার হাতে দিল। তার পেছন পেছন ১৪ নম্বর ঘরের সামনে এসে টোকা দিতেই খুলে গেল দরজা। এ ঘরটা তিন নম্বরের ডবল। সিটিং কাম অফিস মনে হয়।

দেয়ালে দেয়ালে নানান অয়েলপেন্টিং, একটা কাঠের হাতির মাথা তার মুখোমুখি। নানা জায়গায় কিউরিও। থামের ওপর, টেবিলের ওপর। একটা বিরাট

অর্ধচন্দ্রাকার সেক্রেটারিয়েট টেবল। ওপাশে সিংহাসনের মতো উঁচু চেয়ার। জেগে আছে কাঁচা পাকা চুলে ভরা একটি মাথা, চুল খুব স্টাইলে বাঁধা। তার ঢোকার শব্দ হতেই চেয়ার ঘুরে গেল। ভদ্রমহিলা শ্বেতপাথরের মতো ফর্সা। চোখে হালকা সুরমার ছোঁয়া। ঠোঁটে আলতো লিপস্টিক। শাদা সিল্কের সরু রুপোলি জরির পাড় দেওয়া শাড়ি আর ব্লাউজ পরা ভদ্রমহিলা। লেডি রাণুর মতো হয়তো নয়, কিন্তু আরও ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বশালিনী। ভুরুতে সামান্য ভাঁজ। সুমনা দুহাত জড়ো করে নমস্কার করলো।

— একা কেন?

— চার বছরের বাচ্চাকে নিয়ে একটা লোকভর্তি ঝুড়ির মতো ভটভটিতে আসার দুর্বুদ্ধি আমার হয়নি। বিশেষত যেখানে আমাকেই হাতড়ে হাতড়ে একটা অচেনা ভূতুড়ে বাড়ির মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে...

— মানে?— তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠলেন উনি।

— মানে কী? আপনিই বলুন! ক্যানিং-এ নদীঘাটে কোনও লঞ্চ ছিল না, এই দ্বীপে ফেরিঘাটে কোনও লোক ছিল না, এই বাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ আমাকে ওয়েলকাম করেনি। আমার কোনও ইচ্ছেই ছিল না আসার। নেহাৎ আপনি...কথা দিয়ে কোনও কথা রাখবেন না ...এতটা আমি ভাবতে পারিনি।— তার গলার স্বর তীব্র নয়, কিন্তু নীরস।

— হোয়াট ডু য়ু মীন? ক্যানিং-এ আমাদের লঞ্চ ছিল না? ফেরিঘাটে লোক ছিল না? বাড়িতে কেউ তোমাকে...

— না।— দৃঢ় গলায় সে বললো।

— আই সি।— মহিলার মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

সুমনা বললো— আমি কালই ফিরে যাবো। সম্ভব হলে এখনই যেতাম।

মহিলা একটা বেল টিপলেন। উর্দিপরা লোকটি ঢুকলো।

— তেজস্বিনী মেমসাবকো বুলাও।

লোকটি সেলাম করে চলে গেল।

— বসছো না কেন? না বসলে কিসের সমাধান হবে?

সুমনা যেমন দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়েই রইল।

খটখট শব্দ বাইরে, কালো শাড়ি পরা মেয়েটি এসে ঢুকলো। ওহ্, এই তাহলে রঞ্জনের সেই ওল্ড ফ্লেম! সুন্দরী, কিন্তু দাম্ভিক, জেদী, স্বার্থপর সেটা দেখলেই বোঝা যায়। এখন খুব সম্ভব রঞ্জনের স্ত্রীর মাপ নিচ্ছে।

— সুমনার ঘর দেখিয়ে দাও।

— হয়েছে।

— কোনও অযত্ন অসুবিধে যেন না হয়। ওর দেখাশোনার জন্যে রতনলালকে দাও। সব সময়ে থাকবে। সুমনা তুমি বিশ্রাম নাও। রাত্তিরবেলা আমরা একসঙ্গে খাবো। একটা কথা...হাতটা ওপর নিচ করলেন উনি—' এভাবে নয়, সাজগোজ করে আসবে।

১৩

বাথরুমটা তার ফার্নরোডের বাড়ির শোবার ঘরের চেয়েও বড়। চমৎকার বাথটব। নির্বাক লোকটি বাথটব ভরে, তাতে সুগন্ধি ছড়িয়ে দিল। ঘরের টেবিলে মস্ত বড় ফুলদানিতে ফুল এনে রাখলো। নিচু হয়ে নমস্কার করে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক ধরে চানের উষ্ণ আরাম নেবার পর, সুমনার ঘুম এসে যাচ্ছিল। কিন্তু সে বেশ কিছুক্ষণ ধরে মন দিয়ে প্রসাধন করল। নীল সমুদ্র রং শিফন শাড়ি। ভিজে চুলগুলো ড্রায়ারে শুকিয়ে একটা ক্লিপ দিয়ে বেঁধে রাখলো। চোখে কাজল, মাসকারা, গালে সামান্য ব্লাশার। ঠোঁটে হালকা গোলাপি লিপস্টিক। সাজ দেখাচ্ছো রাজেশ্বরী দেবী? সাজগোজ করে আসতে হবে? ঠিক আছে। আয়নায় নিজেকে দেখে তার ভালোই লাগলো। তুমি যত রূপসীই হও তেজস্বিনী ভাটিয়া, রঞ্জন ভালোবেসেছিল আমাকে, আমাকে, তোমাকে নয়। রঞ্জনের স্কেচটার দিকে চাইল সে। হঠাৎ কী মনে করে ফুলদানের গুচ্ছগুচ্ছ সাদা ফুল থেকে একগুচ্ছ নিয়ে কানের পাশে পিন দিয়ে আটকে নিল। সে এভাবে সাজলেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো রঞ্জন। বলতো— তুমি কি ম্যাজিক জানো?

— কেন!

— একেকটা ড্রেসে তোমার ব্যক্তিত্বের একক রূপ ফোটে।— ও অবশ্য এসব কথা ইংরেজিতেই বলতো।

দোল চেয়ারটায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। এখন বেশ অন্ধকার। জোনাকি জ্বলছে এত যে সে একটা দেখবার জিনিস। ঝিঁঝির আওয়াজ ক্রমশ এত জোর হয়ে যাচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত সুমনা কানে আঙুল দিল। ওঃ কী একখানা জায়গা! একদিন দুদিন দল বেঁধে বেড়াতে আসা যায়। কিন্তু দিনের পর দিন এখানে থাকা! এই ভয়ংকর দ্বীপটাকে ও এত ভালোবাসতো! এ তো সভ্য জগতের বাইরে। পুরো দ্বীপটার যেন একটা স্বাধীন সত্তা আছে। ইচ্ছা-অনিচ্ছা। কে জানে রঞ্জন সরে যাচ্ছে বুঝে এই দ্বীপটাই ওকে মরণটানে টেনে নিল কিনা!

চানের আগেই ওকে চা এবং কিছু খাবার দিয়ে গিয়েছিল রতনলাল। খাওয়া, চান, তার ওপর বাইরের ওই ঝনঝনে অন্ধকার। সুমনা ঘুমিয়ে পড়ে।

কোথাও একটা গম্ভীর ঘণ্টা বাজছে। গং গং গং বেজেই যাচ্ছে। চার্চে কী? সে কি চার্চে রয়েছে! প্রেয়ারের সময় হল? দরজায় টোকা। সে জেগে উঠলো। কুপকুপে অন্ধকার এখন বাইরে। ঘরে জ্বলজ্বলে আলো, সে দরজা খুলে দিল— রতনলাল। মুখের কাছে আঙুল দিয়ে খাওয়া বোঝালো। আয়নায় সে নিজেকে একবার দেখে নিল,

একটু ঠিকঠাক করে নিল। দরজায় চাবি দিল। চাবিটায় আংটা আছে কোমরে ঝোলাবার। সেও এখন হাই হিল পরেছে। তবে তার জুতোর আওয়াজ খটখট খটখট নয়।

বিশাল ডাইনিং হল। বিরাট টেবিল। তাদের হোটেলের ছোট ব্যাংকোয়েট রুমটার মতো। মাথার ওপরে ঝাড়। একদিকের প্রান্তে বসে রাজেশ্বরী। তাঁর মুখ চোখ এখন অনেক সজীব দেখাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে নার্সজাতীয় একজন মহিলা। টেবিল ঘিরে আরও বেশ কিছু মানুষ যাদের সে চেনে না। রাজেশ্বরী নিজের ডান দিকের চেয়ারে তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। সব শেষে ঢুকলো তেজস্বিনী। সে বেয়ারা দুজনকে নির্দেশ দিচ্ছে খুব নিচু গলায়। ট্রলিতে করে খাবার আসছে।

রাজেশ্বরী বলে উঠলেন— সুমনা, তোমার আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচয় করো। অন্য কোনও আত্মীয় তো যতদূর জানি তোমার নেই, তুমি অরফ্যান, অ্যাম আই রাইট?

দপ করে জ্বলে উঠলো সুমনার ভেতরটা। কিন্তু সংযত রাগের সুরে সে বললো— আত্মীয় ঠিক কাকে বলে আমি নিশ্চিত নই ম্যাডাম। তবে কথাটার মানে যদি হয়— ভালোবাসার, আশ্রয় দেবার, সাহায্য করার লোক— তাহলে তা আমার আছে। আপনি ভাববেন না।

সব মুখগুলোই সুমনার দিকে, কিন্তু সুমনা সেদিকে তাকালো না।

রাজেশ্বরী হেসে বললেন— গুড। স্মার্ট। যাই হোক যারা তোমাকে ভালোবাসে না, আশ্রয় দেয় না, সাহায্য করে না মনে করছ অথচ ঘটনাচক্রে তোমার আত্মীয় হয়ে গেছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করো। টেবিলের উল্টোদিকে, তাঁর মুখোমুখি, আঙুল দেখিয়ে বললেন— আমার বড় নাতি প্রদীপনারায়ণ।

ভদ্রলোক পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, খুবই সৌম্য চেহারার। একটু লাজুক মনে হল। হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। তারপর চোখ নিচু করে ফেললেন।

— ওর বাঁ দিকে বুঝতেই পারছো আমার বড় নাত বউ, মাই ফার্স্ট গ্র্যান্ড ডটার ইন ল— শর্মিষ্ঠা। খুব বড় ঘরের মেয়ে। ওর বাবা জাস্টিস ব্যানার্জি সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন। এলাহাবাদে আমাদের রিয়্যাল এস্টেটের ব্যবসা। প্রদীপ দেখে।

শর্মিষ্ঠা একটু নধর চেহারার। ফর্সা। মাথায় অনেক চুল, একটা বড় খোঁপা ঘাড়ের কাছে। বড় বড় চোখ, নাক। একটু বোদা লাগল সুমনার। মহিলা বেনারসি শাড়ি পরেছিলেন। এবং যথেষ্ট গয়না। বড় ঘর, তাতে আর সন্দেহ কী! সুমনা নমস্কার করল, ভদ্রমহিলা খালি হাসলেন।

রাজেশ্বরীর দৃষ্টি ঘুরে যায়।— তোমার বাঁ দিকে আমার ছোট নাতি অর্জুননারায়ণ। এর সঙ্গেই রঞ্জনের মিল সবচেয়ে বেশি। সেই ভয়ানক ঝড়ের রাতের কথা মনে করে কেঁপে উঠলো সুমনা। অর্জুন তার চোখে চোখ মেলাতে পারছে না। আড়ষ্টভাবে নমস্কার করলো। সম্ভবত সেই ভয়ানক রাতের কথা তারও মনে পড়ছে।

— পাশে বুঝতেই পারছো অর্জুনের স্ত্রী, মাই ইয়াংগেস্ট ডটার ইন-ল রাখী। রাখী বললো— হাই, সুমনাও জবাব দিল— হাই।

— রাখীও খুব বড় ঘরের মেয়ে। ওর বাবা ইন্ডিয়ার বিগেস্ট ক্লোদস এক্সপোর্টার টু দি ইউ.এস.এ.। অর্জুন এখন ওর বাবার পার্টনার। আমার তরফ থেকে। রাখী দার্জিলিং-এ আগাগোড়া মানুষ। শিলিগুড়িতে আমার ফুড প্রসেসিং-এর ব্যবসা আছে। অর্জুন-রাখী সেটাও দেখছে, আমার মেজ নাতির অবর্তমানে। অন মাই বিহাফ। ইন ফ্যাক্ট আমাদের সম্পত্তির প্রতিটি টুকরো এই আমার হাতের মুঠোয়। ডান হাতটা তুলে মুঠো করলেন ভদ্রমহিলা একটা অদ্ভুত হেসে। টেবিলের অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন— আর ও হল তেজস্বিনী, আমার বাল্য বন্ধু ক্যাপটেন ভাটিয়ার মেয়ে। আমার মেজ নাতি সৌভিক নারায়ণের বিধবা স্ত্রী। বর্তমানে ও আমার সেক্রেটারির কাজ করে। উত্তরপ্রদেশ, নর্থ বেঙ্গল, দক্ষিণ বাংলায় ছড়ানো বিস্তৃত জোত-জমা-ব্যবসা পত্র ইনভেস্টমেন্টের চাবিকাঠি আর পুরো হিসেব ওর হাতে। এখানে আমার হয়ে হোস্টেসের কাজটাও ও-ই করে। এমন শিখেছে যে কোনও মাল্টিন্যাশন্যাল ওকে লুফে নেবে। তবে সে সব জায়গায় যোগ দিতে হলে ওকে এই ডাইনি বুড়ির মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ধূর্ত এক ধরনের খ্যাঁক খ্যাঁকে হাসি হাসলেন উনি।

— কী হল? খাওয়া শুরু করো!

সুমনা এই সময়ে খুব নিচু স্বরে বলতে লাগলো হে ঈশ্বর। তুমি আমাকে এই যে অন্নজল দিলে তোমার অসীম করুণা দিলে তার জন্য তোমাকে নমস্কার...

রাজেশ্বরী বললেন— ওহ্। গ্রেস বিফোর মীট। আমি ভুলে গিয়েছিলাম তুমি ক্রিশ্চান।

সুমনা বললো— রোম্যান ক্যাথলিক।

রাজেশ্বরী বললেন— ওহ্! ইউস আ গুড জেসচার। তবে কি জানো ইয়াং লেডি, আমাদের ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনেও এ জিনিস আছে। নিষ্ঠাবান লোকেরা অন্ন ঈশ্বরকে নিবেদন করে খান। তবে আমার কথা যদি বলো আই লাইক মাই ফুড অ্যান্ড ড্রিংক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই, কিম্বা নিবেদন করার দুর্মতি। সো লেটস স্টার্ট।— এমন করে বললেন যেন রেফারি বাঁশি বাজাচ্ছে।

সুমনা লক্ষ্য করলো একমাত্র রাজেশ্বরী ছাড়া আর কেউই খুব স্বস্তিতে খাচ্ছে না। যদিও বেশ ভালো রান্না, ভালো ভালো পদ। রাজেশ্বরী খেলেন খুব কম। কিন্তু খুব তৃপ্তির সঙ্গে। একবার বললেন— জিনি, আজ বোধহয় রান্না ভালো হয়নি। কেউ ভালো করে খাচ্ছে না। রাখী তুমি আর ডায়েটিং করো না। খ্যাংরাকাঠি আর মডেল যাই বলো— হয়ে কী লাভ! য়ু হ্যাভ প্লেন্টি টু ডু, অ্যান্ড প্লেন্টি টু এনজয়। অর্জুন তুমিও কি বউয়ের পাল্লায় পড়েছো। বিরিয়ানি নিচ্ছো কই? ...প্রদীপ এরই মধ্যে হাত গুটিয়ে নিলে। শর্মিষ্ঠা তোমার এই সাধুপুরুষ স্বামীটিকে আজও বশ করতে পারলে না।

সুমনা কী খাচ্ছিল, খেয়ালই করছিল না। ক্রিম দিয়ে বাগদা চিংড়ির একটা পদ সে খেয়াল করলো। এটা তাদের হোটেলের শেফকে বলতে হবে। এতে আর কী কী আছে মোটামুটি বললেই ভদ্রলোক ধরে নেবেন।

ফিঙ্গার বোল এলো। রাজেশ্বরী বললেন— সুমনা তুমি বড্ড রাগ করে আছো, কিছুই খেলে না।

সুমনা একটু হাসলো, বললো— আমি যা খাবার ঠিক খেয়ে নিয়েছি।

রাজেশ্বরী বললেন— বাস এবার আমি বিশ্রাম নেবো। কিন্তু তোমরা, প্রদীপ, শর্মিষ্ঠা, অর্জুন, রাখী এবং জিনি তোমরা পার্লারে যাও। সুমনার সঙ্গে আলাপ করো। ওর ধারণা আমরা ওকে আত্মীয় ভাবছি না। মাইন্ড ইট। তোমাদের আলাপের বিষয় ও ফলাফল কী হয় আমি কাল শুনবো।

তেজস্বিনী ও নার্স মহিলা হুইল চেয়ার আনে। ডাইনিং চেয়ার চাকা ঘুরিয়ে নিচু করে, অদ্ভুত কায়দায় রাজেশ্বরী হুইল চেয়ারে উঠে যান। তেজস্বিনী চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে রাজেশ্বরী আঙুল তোলেন— বাস এই পর্যন্ত জিনি। তুমি ওদের সঙ্গে যোগ দাও। আমি এবার চলে যেতে পারবো। নিজেই হুইল চালিয়ে চলে গেলেন, পেছন পেছন গেল নার্স মেয়েটি।

তেজস্বিনী অর্ধেকটা ওদের দিকে ফিরে বললো— দাদা, আপনারা বসুন। আমার আসতে একটু দেরি হবে। কাউকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে চলে গেল।

ডাইনিং হলের পাশেই পার্লার। প্রদীপ এগিয়ে এসে খুব নরম গলায় বললো— সুমনা এসো, আমরা একটু গল্পসল্প করি।

সুমনা ঢুকে দেখলো অর্জুনের সোফার হাতলে বসেছে রাখী। সত্যিই মেয়েটি খুবই তন্বী। এবং সাজ পোশাক একটু কৃত্রিম, খানিকটা মডেলদের মতো। খাবার ঘরে অর্জুন, রাখী তার পাশাপাশি বসেছিল বলে সে ভালো করে দেখতে পায়নি। শর্মিষ্ঠা একটা আলাদা সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। খাবার ঘরে যে আড়ষ্টতা ছিল তা থেকে ছাড়া পেয়ে সবাই যেন বেঁচেছে। সুমনা প্রদীপের মুখোমুখি একটা সোফায় বসেছে। সে বললো— সুমনা, মেয়েকে কার কাছে রেখে এলে?

শর্মিষ্ঠা অমনি বলে উঠলো— হ্যাঁ আমরা ভাবছিলাম তোমার তো সত্যি সেভাবে কেউ নেই, না নিয়ে এসে ভুল করেছো ভাই!

প্রদীপ স্নিগ্ধ স্বরে বললো— না। ও ঠিক করেছে। রাস্তাটা তো গোলমেলে। এতটা নদীপথ। তাছাড়া একেবারে নতুন জায়গা। সুমনা বুদ্ধিমতী মেয়ে।

শর্মিষ্ঠা আর রাখী চোখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসলো।

সুমনা প্রদীপের দিকে তারপর শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে বললো— আমার কনভেন্টের সিস্টারদের কাছে রেখে এসেছি। আপনাদের ভাবনার কোনও কারণ নেই।

প্রদীপ বললো— ওই আমাদের একমাত্র বংশধর। এখনও পর্যন্ত। দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল।

অর্জুন বললো–– আমি অবশ্য জাস্ট এক ঝলক দেখেছি। একেবারেই শিশু তখন। ঠাকুমার মতো ফর্সা। তোমার মতো কোঁকড়া চুল। সুমনা, তোমাকে তুমি বলছি কিন্তু। দাদা ঠিকই বলেছে। আমাদের একমাত্র বংশধর।

রাখী বললো— ওহ অর্জুন, হাউ য়ু টক। জাস্ট পাঁচ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। এক্ষুনি ধরে নিলে কিছু হবে টবে না!

শর্মিষ্ঠা বললো— সত্যি আশ্চর্য! আমাদের না হয় সাত আট বছর হয়েছে। কিন্তু আশা ছাড়ার তো কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সবাইকারই কি বছর ঘুরতেই...

প্রদীপ তাড়াতাড়ি বললো— আমি বলেছি এখনও পর্যন্ত। কথাটা বোধহয় তোমরা কেউ খেয়াল করোনি।

অন্যদিক থেকে কেউ বলে উঠলো— অভিশপ্ত ফ্যামিলি। এখানে আর কেউ আসবে না।

সবাই চমকে মুখ তুলে দেখলো তেজস্বিনী। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন দৈববাণীর ভঙ্গিতে বললো কথাগুলো। অন্যদের থেকে যত দূরে সম্ভব বসলো। সুমনার সঙ্গে চোখাচোখি হল। কেমন একটা হিংস্রভাব। চোখের ওপর আলো পড়ে যেন জ্বলছে।

সুমনা তার দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। মনে পড়লো— রঞ্জন বলেছিল শী হ্যাজ আ টেরিবল ইগো।

রাখী হঠাৎ একটু দুষ্টু দুষ্টু ন্যাকা ন্যাকা ভঙ্গি করে বললো— সুমনা, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তোমার আর রঞ্জনের কথা...

শর্মিষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল— সত্যি! আসলে এই ব্যাপারটা একটা মিস্ট্রি আমাদের কাছে। শাকম্ভরীর বাঘকে তুমি-ভাই কী করে বশ করলে? জাদু জানো, না কী?

প্রদীপ বললো— আহ্ শর্মিষ্ঠা!

শর্মিষ্ঠা বললো— তোমরা ছেলেরা উঠে যাও না বাবা। আমাদের সুমনার সঙ্গে অনেক অনে-ক প্রাইভেট কথা আছে। যাও প্লিজ।

অর্জুন হঠাৎ একটু অস্বাভাবিক উত্তেজনা নিয়ে বলে উঠলো— হ্যাঁ হ্যাঁ জেনে নাও. জেনে নাও, অনেক কিছু জানতে বাকি আছে তোমাদের...সে তীব্র চোখে রাখীর দিকে তাকালো।

রাখী বললো–– আহা, রাগ করছো কেন? বি স্পোর্টিং...আমরা তিনজনে মিলে আজ সুমনার সঙ্গে...বুঝলে জিনি?

দেখা গেল তেজস্বিনী নেই। উঠে গেছে।

সুমনা প্রদীপের দিকে চেয়ে বললো— যদি কিছু মনে-না করেন আমি এবার একটু রেস্ট করব। সে সবার দিকে তাকিয়ে বললো— গুড নাইট। কোনও উত্তরের অপেক্ষা করল না। চলে গেল।

অর্জুন চাপা গলায় বললো— রাখী, তোমাকে বারবার বারণ করে দিচ্ছি, এসব নিয়ে ওকে বিরক্ত করবে না। কিসের থেকে কী মনে হবে! শী ইজ নো ফুল!

শর্মিষ্ঠা বললো— আহা, আমরাই কি ফুল। জাস্ট মজা!

রাখী বললো— অ্যান্ড কৌতূহল! আ অ্যাম ভেরি ভেরি কিউরিয়াস। এই শাদামাটা মেয়েটার মধ্যে কী এমন দেখল রঞ্জন!

শর্মিষ্ঠা বললো— আ অ্যাম ডাইং উইথ কিউরিয়সিটি।

দুজনেই হেসে উঠল। অর্জুন বিষণ্ণ গলায় বললো— আনফর্চুনেট, ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট... স্যাড।

শর্মিষ্ঠা বললো— এগজ্যাক্টলি, আমাদের সঙ্গে যায় না।

রাখী বললো— সেটা তো রাজরাজেশ্বরী একরকম বলেই দিলেন, মুখের ওপর।

প্রদীপ বললো— রাখী, ঠাকুমার সম্পর্কে এভাবে কথা বলাটা আমার অরুচিকর মনে হচ্ছে। অর্জুনের কথা জানি না অবশ্য। আর সুমনার কথা যদি বলো— শী ইজ আনস্পয়েল্ট, চার্মিং, সিনসিয়ার অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইনটেলিজেন্ট!

শর্মিষ্ঠা বললো— বিশেষণের বান ডাকিয়ে দিলে যে! ভেরি ভেরি ইনটেলিজেন্ট? তাই নাকি?

রাখী বললো— শর্মি, দাদার অর্জুনের সবারই ভেরি ভেরি ইনটেলিজেন্ট অ্যান্ড সিনসিয়ারকে পছন্দ। বুঝলে? ওর সবই ভালো। নকল মুক্তোর মালা থেকে কানের পাশে ফুলের গোছা! স— ব।

অর্জুন একটু হেসে বললো, তোমরা কি জানো ও একটা ফোর স্টার হোটেলের লিয়াজঁ অফিসার! ডোন্ট প্রিটেন্ড যে এই স্টেটাসের একটা মেয়ে ড্রেস করতে জানে না। শী ইজ সিম্পল অ্যান্ড গ্রেসফুল।

শর্মিষ্ঠা ভুরু কুঁচকে বললো— আচ্ছা খাবার সময়ে ওর ওই গ্রেস-এর ঢংটা করা কি উচিত হয়েছে। উই আর নট ক্রিশ্চানস।

রাখী বললো— ইমপ্রেস করার চেষ্টা। ও যে ক্রিশ্চান, এবং সেই আলাদা আইডেনটিটি বজায় রাখতে চায় এটা আমাদের কায়দা করে জানিয়ে দিল। কানিং।

প্রদীপ বললো— তুমি শোনোনি বোধহয় ও রোম্যান ক্যাথলিক। ক্যাথলিকরা একটু বেশি আচারপরায়ণ হয়। তার ওপর কনভেন্টে মানুষ। দ্যাট ইজ হার হ্যাবিট, সেকেন্ড নেচার।

প্রদীপ উঠে পড়লো। অর্জুনও উঠে দাঁড়াতে রাখী আদুরে গলায় বললো— থাকো না বাবা আর একটু। দ্যাখো রঞ্জননারায়ণ বিয়ে করল, পরের বছরই বংশধর

এসে গেল। তুমি চার বছর, অথচ...

শর্মিষ্ঠা বললো— আমার কিন্তু গায়ে লাগছে রাখী। আমাদেরও কিন্তু আট বছর। কে জানে বাবা, জিনির অভিশাপ কি না!

দুই ভাই বিরক্ত মুখে চলে গেল। শর্মিষ্ঠা আর রাখী খুব ঘনিষ্ঠভাবে, নিচু গলায় কথা বলে আর হাসে। কথা বলে আর হাসে।

সুমনা নিজের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে পুতুলের মতো বসেছিল। তার কেমন বুক জ্বলছে। কীভাবে কথা বলে এরা! এই কি বনেদিয়ানার শিক্ষা। কী বিশ্রী রুচি! ছি ছি! রঞ্জন মাঝে মাঝে ওর বউদি ও ভাইয়ের বউয়ের কথা বলে ওকে হাসাত বটে! জানলায় সূক্ষ্ম জাল দেওয়া। তা সত্ত্বেও খাটে মশারি টাঙানো টান টান করে। সুমনার পোশাক পাল্টানো হয়ে গেছে। সে আনমনে মুখে ক্রিম ঘষছে। দরজায় টোকা পড়লো দুবার।

সুমনা তাড়াতাড়ি হাউজকোট চাপিয়ে নিল। দরজা খুললো। বাইরে তেজস্বিনী।

বললো— সরি টু ডিসটার্ব য়ু। দেখতে এলাম সব ঠিক আছে কি না। কোনও অসুবিধা?

— না ধন্যবাদ।

— কী ক্রিম মাখছো? ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ারে সব আছে। কসমেটিকস্। সব রঞ্জনের পছন্দের। ইমপোর্টেড। ওর পছন্দের পার্ফুম রয়েছে। তুমি বোধহয় জানো, ...জানো না? আই সি।— তার কথার মধ্যে একটা গোপন বিদ্বেষ। যদিও আপাতদৃষ্টিতে খুব ভদ্র। আয়নার দিকে তাকিয়ে সুমনা দেখতে পেল তেজস্বিনী ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। দৃষ্টিটার মানে বুঝতে পারলো না সুমনা। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললো— গুড নাইট। বেড-এর সঙ্গে বেল আছে। দরকার হলে টিপো। রতনলাল চলে আসবে।

দরজা বন্ধ করতে করতে সুমনার মনে হল মেয়েটি সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর। কী গ্রেসফুল, কী পয়েজ! অন্য দুজনের মতো একেবারে না। এত সুন্দরী, গুণী একটি মেয়েকে ছেড়ে রঞ্জন কেন তাকে বিয়ে করল! আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বর দিকে তাকিয়ে তার চোখ জলে ভরে এল। তবু, তবু রঞ্জন তাকেই ভালোবেসেছিল। ভালোবাসা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের জিনিস। সৌন্দর্য দিয়ে, গুণ দিয়ে কিছু দিয়েই তাকে পাওয়া যায় না। কোনও অন্তর্নিহিত রহস্যময় কারণে একজনের সঙ্গে আরেকজনের মনের মিল হয়। সেই মিল তারই সঙ্গে খুঁজে পেল রঞ্জন।

অন্যমনেই সে ড্রয়ার খুলল। বাপ্স্। সত্যিই কসমেটিকস-এ ভর্তি। এ সব এ সব তো কোনদিন তাকে কিনে দেয়নি রঞ্জন! কে জানে হয়ত পেরে উঠতো না। রাজকুমারের রুচি তো এইরকম মহার্ঘ হবেই। কিন্তু সে যদি রাজ্যহারা হয়, যদি মাসমাইনেতে সংসার চালাতে হয়...! একটা পার্ফুম তুলে নিল সে। আরে এইটাই তো সে নিজেই একদিন কিনে মেখেছিল! খুব দামী ফরাসি পার্ফুম। কী ভীষণ রেগে

গিয়েছিল সেদিন রঞ্জন! বাতাসে নাক তুলে বললো— এ পার্ফুম তুমি কোথায় পেলে? আই হেট ইট। কোনদিন আর ব্যবহার করবে না। শিশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল জানলা দিয়ে। আশ্চর্য! সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তবে! তবে কি এ পার্ফুম তেজস্বিনীরই? তেজস্বিনী ব্র্যান্ড? তাই সহ্য করতে পারতো না! কী অদ্ভুত সম্পর্ক! এত সুন্দর গন্ধ। সেটাও অসহ্য?

দরজায় আবার টোকা পড়লো।

উঃ। এরা তাকে শান্তিতে ঘুমোতেও দেবে না। সে একবার ব্যাগের দিকে চাইল। ওতে একটা সরু ছুরি আছে। বার করবে না কি? নাঃ থাক। সে সাবধানে দরজাটা খুললো। বাইরে প্রদীপনারায়ণ।

— সস্ মানে সুমনা। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, য়ু আর আ ওয়ান্ডারফুল গার্ল। কিছু মনে করো না কারো কথায়, ব্যবহারে। দে... দে আর... উই আর অ্যান আনফর্চুনেট লট ভাই। মাফ করে দিও।— হঠাৎ মুখ তুলে ভদ্রলোক বললেন— ও কী? কেয়া? কেয়া কে রেখেছে তোমার ঘরে? কেয়ার গন্ধে সাপখোপ আসতে পারে। এই দ্বীপে ওই জিনিসটির অভাব নেই। বি কেয়ারফুল। একটু দাঁড়ালেন যেন আরও কিছু বলবেন, বললেন না, ইতস্তত করলেন একটু তারপর বললেন, আচ্ছা আসি। হ্যাভ আ গুড স্লীপ।

দরজা বন্ধ করে ফুলদানটার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তাই বলো? কিছু সাদা থোকা থোকা ফুল ছিল, যার থেকে বেছে চুলে পরেছিল সে। মাঝখানে এই লম্বা ফুলটাই সেই বিখ্যাত কেতকী? নামই শুনেছে। দেখেনি কখনও। কী উগ্র গন্ধ! সাপ আসে! কী ভয়ানক! কেউ কি এইভাবে তাকে খুন করার চেষ্টা করছে? ভাগ্যিস টুকটুককে আনেনি। ভাগ্যিস সরিৎদার কথা শুনেছিল! ফুলটা সুন্দর। সে ফুলটা তুলে নিয়ে জানলার কাছে গেল। একটা ফ্রেমের মধ্যে জাল, এগুলো খুলে নেওয়া যায়। সে এদিক-ওদিক দেখে ফ্রেমটা খুলে নিল, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল ফুলটা। পাখা চালিয়ে দিল জোরে। তারপর মশারি তুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভোর হচ্ছে। পাখির ডাকে ভরে যাচ্ছে চতুর্দিক। এত ডাক এত ডাক যে ঘুম ভেঙে যায়। ক্রমশ চারদিক ঝলমল ঝলমল করে। রাজেশ্বরীর ঘর অফিস ঘরের সংলগ্ন। তিনি ব্রেকফাস্ট সারছেন। তাঁর সঙ্গে খাচ্ছে তেজস্বিনীও। একটু দূরে নার্স মহিলা দাঁড়িয়ে। খাওয়া পরিপাটি করে শেষ করে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছলেন। বললেন— জিনি, ওর ব্যবস্থা!

তেজস্বিনী বললো— ঠিক আছে। ব্রেকফাস্ট পাঠানো হয়েছে।

— কে গেল?

— হরিহর।

— হরিহর যাক। তোমার একবার যাওয়া উচিত। সেটা তুমিও ভালোই জানো। ও আমাদের অতিথি। সবাইকার কাছে তোমাকে হোস্টেস বলে প্রেজেন্ট করছি। তার গুরুত্ব বোঝো?

তেজস্বিনী চুপ করে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাজেশ্বরী নরম গলায় বললেন— বুঝতে পারছি কোথায় তোমার লাগছে। কিন্তু দা কিং ইজ ডেড, হি ইজ নো মোর। আর কী এসে যায়! মৃত্যুর পর আর কোনও ভালোবাসা নেই, প্রত্যাশা নেই, প্রত্যাখ্যান নেই, হতাশা নেই। হিংসা অর্থহীন। থেকে যায় শুধু স্তব্ধতা। শান্তি হয় তো নয়। কিন্তু স্তব্ধতা। সব প্রশ্নের সমাধি। জিনি নিজেকে কনট্রোল করো। তুমি দুর্বল চরিত্রের মেয়ে হলে আমার সবচেয়ে দরকারি, সবচেয়ে গোপন কাজগুলো তোমাকে দিয়ে করাতাম না। য়ু আর আ জুয়েল অব আ উওম্যান। নাউ নাউ জিনি কনট্রোল ইওরসেলফ। অতীতকে অতীতে থাকতে দাও। এখন গিয়ে দেখো ও খেলো কি না। ভালো লাগল কিনা, তারপর ওকে ডাকো। ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। শী ইজ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট ফর মাই ফিউচার প্ল্যানস।

— গীতা। এগুলো নিয়ে যাও।— নার্স ব্রেকফাস্টের ট্রে সব নিয়ে গেল। রাজেশ্বরী হুইল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জানলার কাছে গেলেন, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন স্নিগ্ধ বনভূমির দিকে। কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তার পর তিনি আবার চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অফিসঘরে গেলেন। সেক্রেটারিয়েট টেবিল নয়। কিছুদূরে সোফা-কৌচ পাতা, নিচু টেবিলের ওপর ডোঙার মতো ফুলদানি ভর্তি টাটকা ফুল। সেখানে এসে চাকা থামালেন। মিনিট পাঁচ ছয় পরেই সুমনা ঢুকলো।

সে চান সেরেছে। চুল খোলা ভিজে। সে সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে। দেখাচ্ছে আরও ছেলেমানুষ, সজীব। কোনও প্রসাধন করেনি।

— বসো। তেজস্বিনী-ই-ই।— একদিকের দরজা দিয়ে তেজস্বিনী ঢুকে আসে।

সুমনা বললো— আমি বসতে আসিনি ম্যাডাম। আমি চলে যেতে চাই। এক্ষুনি।

— কেন? আশ্চর্য হয়ে উনি বললেন— তোমার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করেছে?

— দেখুন, প্রথমত আপনি কোনদিন আমাকে স্বীকার করেন নি। বারবার রঞ্জনকে ডেকেছেন, আমাকে ডাকেন নি, সেটা আমার পক্ষে চূড়ান্ত অপমান। রঞ্জনও তাই মনে করতো। এনিওয়ে। আজ কেন ডাকছেন আমি এখনও বুঝতে পারছি না। ডাকলেন, লিখলেন নাকি আমার জন্য সব ব্যবস্থা থাকবে। কোথাও কিছু ছিল না। ক্যানিং-এ কোনও লঞ্চ না, ফেরি ঘাটে কোনও লোক না। কেউ দরজা খুলে অভ্যর্থনা করেনি। পথ দেখিয়ে দেয়নি। আমি তো আসতে চাইছি না। শুধু শুধু এতটা পথ এসে এই অবজ্ঞা সইবার কোনও মানে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

— চুপ করো। চুপ করো মাই গার্ল। কী বললে? আমি তোমাকে কোনদিন ডাকি নি? রঞ্জনকে একা ডেকেছি? দ্যাটস আ লাই। আমি প্রত্যেকবার তোমাকে ডেকেছি। দেখতে চেয়েছি! প্রত্যেকবার! জিনি!

তেজস্বিনীর মুখ অস্বাভাবিক সাদা দেখাচ্ছে।

— ওই চিঠিগুলোর কপি আছে?

— না।

— কেন?

— কত জাংক জমাবো? মাঝে মাঝে তো সাফ করতেই হয়!

— সুমনা তোমার কাছে আছে?

— না। চিঠি রঞ্জনের কাছেই আসতো, ও-ই পড়তে., প্রচণ্ড রেগে যেত। ও ও আসতে চাইত না। আমিই জোর করে পাঠাতাম। এখন সেসব কোথায় গেছে আমার জানা নেই।

— সেকেন্ডলি কী যেন বললে? ক্যানিং-এ শাকম্ভরী সার্ভিসের কোনও লঞ্চ ছিল না? ফেরিঘাটে তোমাকে নিতে কেউ যায়নি? কালও বলেছিলে বটে। জিনি-ই! এসব কী?

— ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আমার কাজ। দিয়েছি। বাড়ির মধ্যে গেস্টরুম গুছিয়ে রাখার কথা রেখেছি। সুবিধে-অসুবিধের খোঁজ নিয়েছি। কাল রাতেও। যদি কোথাও কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে যায় দুঃখিত, এখন আমার জরুরি কাজ আছে। যেতে পারি?

— যাও।— তেজস্বিনী খটখট করে চলে গেল। তার কথাবার্তা, চলন সব কিছুতেই একটা বিদ্রোহ।

তেজস্বিনীর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বৃদ্ধা বললেন— উদ্ধত। ইমপার্টিনেন্ট। রঞ্জন আমারই রক্ত। সে কখনও ইমপার্টিনেন্স অ্যারোগ্যান্স সইবে না।

সুমনা তুমি শুধু আজ কেন কালও যেতে পারছো না। কোনও লঞ্চ আসবে না। কাল আমার জন্মদিন। দিনটা খুব ইমপর্ট্যান্ট। কেন সেটা সেই দিন বুঝতে পারবে। তার আগে নয়। কদিন এখানে থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে না থাকো তো, তোমার সাইজের সালোয়ার কামিজ, জিন্‌স্‌-টপ যা তোমরা পরো এবং শাড়ি সব আছে, ভর্তি তোমার ওয়ার্ডরোব। প্রত্যেক জন্মদিনে যেমন রঞ্জনকে দিয়েছি তেমন তোমার জন্যেও কিনেছি, করিয়েছি। তুমি এখন যেতে পারো।

উনি বেল টিপতে যাচ্ছিলেন। সুমনা বললো— আমি একাই যেতে পারবো।

পারবে জানি। কিন্তু রতনলাল তোমার সঙ্গে সবসময়ে থাকবে এই আমার হুকুম। যেখানে খুশি যাও। যা খুশি করো। ঘুরে দেখো এই দ্বীপ। খালি আমার ব্যবস্থা মানতে হবে।

নিজের ঘরে গেল সুমনা। রতনলালের সঙ্গে। ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এর মানে? উনি বলছেন উনি প্রথম থেকে তাকে ডেকেছেন? অথচ চিঠি সে ভাবে লেখা হয়নি! মিথ্যেটা কে বলছে? উনি না তেজস্বিনী? সমস্ত ব্যবস্থা উনি তেজস্বিনীকে করতে বলেছেন। সে-ও যথাযথ নির্দেশ দিয়েছে। অথচ নির্দেশ মানা হয়নি। কে মাঝখান থেকে এসব ভণ্ডুল করলো? হঠাৎ তার কী মনে হল, ওয়ার্ডরোবটা খুলল। হ্যাঙারে সারি সারি সালোয়ার কুর্তা। শাড়ি, জিনস, টি-শার্ট। আশ্চর্য এটা তো তাহলে উনি মিথ্যে বলেন নি! নাকি এও একটা চাল! ঠিক আছে রাজেশ্বরী ঠাকুরানী তোমার আলমারির একটা পোশাক আমি পরছি। সে একটা জিনস ও টি-সার্ট-এর সেট বার করে নিয়ে পরলো। নিজের ব্যাগের মধ্যে থেকে বাইনোকুলার বার করে গলায় ঝোলালো। ছুরিটা ক্লিপ টিপে রাখলো প্যান্টের পকেটে। বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে চললো রতনলাল।

কে যেন বলেছিল? রঞ্জনই বোধহয়— জঙ্গুলে চেহারাটা উনি সাবধানে বজায় রাখেন? সত্যি! ওঁর বাড়ির চারপাশের উদ্ভিদ একরকমের। সে চৌহদ্দি পেরোলেই সুন্দরবন, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। হেঁতালের বড় বড় ঝোপ। সুন্দরী গাছ। গরান। এ ছাড়াও আছে শিশু, পাকুড়, প্রত্যেকটি টাইপের গুঁড়িতে নাম লেখা। নদীর কাছাকাছি যেতেই উঁচিয়ে থাকা শূল দেখতে পেল সে। রতনলালের ইঙ্গিতে পেছনে হঠে এল।

— আচ্ছা রতনলাল, তোমাদের এখানে ভালুকটিলা বলে একটা পাহাড় আছে?

রতনলাল উঁচু করে দেখায় হাত নেড়ে না-না করে, তারপর আরেকটু নিচু করে হাতটা। বারবার। একটু চেষ্টা করে সে বুঝতে পারে ও বোধহয় বলতে চাইছে। পাহাড় নয়, টিপি।

— ভালুকটিলায় নিয়ে চলো তো!

এমন সময়ে পেছনে গলার আওয়াজ শোনা যায়। প্রদীপ আর অর্জুন।

— কী? এক্সপ্লোর করতে বেরিয়ে পড়েছো? সুমনা? ওদের গলায় হালকা খুশি।

সুমনা হতাশ মুখে বললো— আপনারা?

অর্জুন বললো— এই সময়টা আমরা বাইরেই ঘুরি। ভেতরে তো তেমন কিছু করবার নেই। ইনডোর গেমস আছে অবশ্য।

প্রদীপ বললো— সুমনার তো খেলাধুলোর অভ্যেস আছে। বিলিয়ার্ডস খেলো?

— চেষ্টা করে দেখতে পারি। কখনও খেলিনি।

— তুমি ভালো করে ব্রেকফাস্ট খেয়েছো তো?

— হ্যাঁ। অনেকক্ষণ।

অর্জুন পকেট থেকে একটা পাউচ বার করে। ভেতরে মেওয়া রয়েছে। সে সুমনার হাতে সেটা দিতে যাচ্ছিল, রতনলাল বিদ্যুদ্বেগে এসে সেটা ছিনিয়ে নেয়। অর্জুন রাগত গলায় বললো— এটা কী হল রতনলাল?

রতনলাল আঙুল দিয়ে বাড়ির দিকে সেখায়। সুমনার দিকে দেখায়, মুখের দিকে আঙুল তাক করে, তারপর দুহাত নেড়ে না-না করতে থাকে।

প্রদীপ বললো— ঠাকুমা ওকে সুমনার বডিগার্ড করে পাঠিয়েছেন অর্জুন। কারো দেওয়া খাবার যেন সুমনা না খায়। নির্দেশ আছে।

লাল হয়ে গেছে অর্জুন। বললো— বশ অ্যান্ড ননসেন্স। এর মানে কী? আমরা সুমনাকে খারাপ কিছু দেবো?

প্রদীপ বললো— রাগ করো না। তুমি তো ওঁকে জানো। কিছু একটা মাথায় খেলেছে। আফটার অল শী ইজ এইট্টি।

— তাই বলে... তাই বলে ভাববেন সুমনাকে আমি বিষ দিতে পারি?

— মেওয়াগুলো তুমি কোথা থেকে এনেছো?

— স্টোর থেকে। অবভিয়াসলি।

— তাহলে?

— কী তাহলে?

— তুমি যে বললে উনি 'তোমাকে' সন্দেহ করছেন, কথাটা ঠিক নয়।

সুমনা হকচকিয়ে গিয়েছিল। এখন সুযোগ বুঝে বললো— রতনদা আমাকে ভালুক টিলায় নিয়ে চলো।

সঙ্গে সঙ্গে দু ভাইয়ের কথা কাটাকাটি থেমে গেল। অর্জুন বললো— ভালুক টিলা? তুমি ভালুকটিলায় যাবে কেন সুমনা?

সুমনা একটু চুপ করে রইল, তারপর বললো— এমনি।

প্রদীপ আস্তে আস্তে বললো— আমি বুঝতে পারছি অর্জুন, ও কেন যেতে চায়। তার সমস্ত মুখটা কষ্টে বিকৃত হয়ে যায়। যেন অনেক চেষ্টায় কান্না থামিয়ে রেখেছে।

অর্জুন বললো— না। যেতে যদি হয় আমরা তোমার সঙ্গে যাবো। জায়গাটা ভালো না। প্রচুর বিছুটি গাছ। জোঁক। রাতে রীতিমতো শেয়ালের আড্ডা বসে।

সুমনা বললো— আমি যাবো। যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।— তার গলা খুব শান্ত। আপনারা যেদিকে যাচ্ছিলেন যান না।

এই সময়ে অদূরে কুকুরের ডাক শোনা গেল। অ্যালসেশিয়ানের চেন হাতে উদয় হল প্যান্ট পরা রাখী ও সালোয়ার ঢোলা কুর্তা পরা শর্মিষ্ঠা।

সুমনা ভদ্রতা করবার কোনও চেষ্টাই করলো না।

শর্মিষ্ঠা বললো— গুড মর্নিং সুমনা।

রাখী বললো— হ্যালো।

অর্জুন বললো— তোমরা?

রাখী একটা ভ্রূভঙ্গি করলো— নতুন হলে না কি? সকালে ওই হানাবাড়ির মধ্যে বসে কি তাস খেলবো?

শর্মিষ্ঠা বললো— এই সুমনা, তুমি ডেফিনিটলি আমাদের ওপর রাগ করেছো। প্লিজ রাগ করো না। কত বড় দিদি তোমার, বলো! আমাদের এই অ্যালসেশিয়ান গ্যারি কিন্তু গোমড়ামুখ দেখলেই কামড়াতে যায়।

সুমনা বললো— আপনি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?

— ওমা! কথা শোনো মেয়ের। ভয় দেখাবো কেন? তুমি একটু হাসো প্লিজ। এত সীরিয়াস থেকো না সবসময়ে।

রাখী বললো— আসলে আমরা তোমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছি ভাই। অনেস্টলি। তিন বছর হয়ে গেল। এখনও যদি তুমি এ রকম...

সুমনা বললো— আপনাদের তিনবছর আর আমার তিনবছর এক নয়। রতনদা, চলো।

রাখী শ্রাগ করলো। শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো। দুজনে কুকুর নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

ওরা কেউ দেখলো না, বেশ কিছু দূরে। একটা ছোট্ট টিপির ওপর থেকে বাইনোকুলর চোখে লাগিয়ে ওদের দেখছে তেজস্বিনী। এবং তেজস্বিনীও দেখল না ম্যানশনের ভেতরে এক জানলা থেকে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে তাকে দেখছেন রাজেশ্বরী দেবী। একটু আগেই তিনি প্রাণপণে হুইল ঘুরিয়েছেন। এখন হাঁপাচ্ছেন। গীতা! গীতা! নার্স মেয়েটি দৌড়ে এল। উনি বললেন। দৌড়ে যাও— জিনি কী করছে, কী দেখছে দেখে এসো। সাবধান, যেন টের না পায়।

গীতা একটু দূর দিয়ে আসছিল। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে। তেজস্বিনী চকিতে বাইনোকুলর নামিয়ে কাঁধের ব্যাগে পোরে। গীতা! গীতা! কোথায় যাচ্ছো? গীতা পেছন ফিরে বললো— মা বললেন কিছু ফুল তুলে আনতে।

— কী ফুল পাবে এখন?

— যে কোনও, গোছা গোছা আনতে বলেছেন।

তেজস্বিনী বললো— চলো আমি দেখছি।

নিজের মনেই সে বললো— দোপাটিগুলো এখনও তেমন হয়নি। শীতকালে এবার ওঁকে গোছা গোছা গোলাপ দেবো। হঠাৎ তার চোখ জ্বালা করে জলে ভরে যায়। কোনও স্মৃতি! দুঃখের! সুখের! সে অন্ধের মতো গীতার পেছন পেছন চলতে থাকে।

রাজেশ্বরী দাঁতে দাঁত চেপে বলেন— ওয়ার্থলেস! একটা কাজ ঠিকঠাক পারে না। কেন এদের রেখেছি? কেন মাইনে দিই এত? তাড়াতাড়ি হুইল চালিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে থাকেন।

— ঠাকুমা আপনি ফুল চেয়েছিলেন? তেজস্বিনী সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

— হ্যাঁ হ্যাঁ। কেমন রাগের গলায় বলেন উনি।

গীতা বললো— জিনিদিদিই তো সব তুললেন। খুঁটিনাটি জানেন কোথায় কী আছে।

রাজেশ্বরী ফুলগুলো কোলের ওপর নিয়ে বললেন— এগুলো সবচেয়ে বেশি ফোটে ভালুকটিলার আশে-পাশে, না জিনি? যখনই দুজনে ওদিকে যেতে আনতে আমার জন্যে! আমি কোনদিন কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করিনি। পুরো ফ্রিডম দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি— য়ু ফূল— তুমিই পারলে না। ইয়োর টেম্পার, ন্যাস্টি টেম্পার। শেষ হয়ে গেল। সমস্ত শেষ। আশি বছর পূর্ণ হবে। দু দুজন নাতি ডেড অ্যান্ড গন।

তিনি কোলের ওপর থেকে ফুলের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর মাথায় হাত দিয়ে মুখটাকে যথাসম্ভব নিচু করে ফেললেন। গীতা তাঁর চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে ঘর পেরিয়ে করিডর পেরিয়ে, ডানদিকে মোড় নিয়ে অন্য কোনও দিকে নিয়ে গেল।

তেজস্বিনীর চোখ জ্বলছে। হাতদুটো সে একবার মুঠো করছে। আবার খুলছে। হঠাৎ নিজের খোলা চুল সে মুঠো করে ধরে। রক্তলাল হয়ে গেছে মুখ। বলে— জানি না কোনটে সহ্য করা বেশি শক্ত। সামবডি ডেড, অর সামবডি অ্যালাইভ। জানি না, জানি না।

সে নিচু হয়ে ফুলগুলো তুলে নিল। নিজের ঘরে চলে গেল। সেখানে রঞ্জনের কোনও ছবি নেই। আছে সৌভিকের। ছবির তলার টেবিলে ফুলগুলো ফেলে দিয়ে সে বলতে লাগল— ওহ, হোয়াই রঞ্জন, হোয়াই, হোয়াই দিস?

সামনে মাতলা ছোট ছোট ঢেউ তুলে বয়ে যাচ্ছে। এত চওড়া এখানটা যে ও পাড় দেখা যায় না। পুরো খোলা আকাশ, নীল। তার ছায়া পড়েছে, খোলা জলের সঙ্গে মিশছে আকাশ-নীল। ভালুকটিলার ওপর থেকে সুন্দরবনের হাওয়া যেন আরও নিষ্কলুষ। একটা শ্বাস নিলেই বোঝা যায় নতুন জীবন ঢুকে গেল ভেতরে। অথচ এইখানে একটা প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন হারিয়ে গেছে। বিশ্বাস করা যায় না— এই জীবনদায়ী স্রোতস্বতী কারও প্রাণ নিতে পারে। জলের ভেতর লুকিয়ে থাকতে পারে বীভৎস মৃত্যু।

টিলার ওপরটা ফুট ছয়েক মতো চতুষ্কোণ জায়গা বেশ পেটানো। তার ওপর এখন অবশ্য অনেক আগাছা, বুনো ফুল।

এইখানটায় টেলিস্কোপটা ফিট করত ও। একেক দিন সারারাত তারা দেখত।— অর্জুন বললো।

— টেলিস্কোপটা এখন কোথায়? খুব কেজো গলায় সুমনা জিজ্ঞেস করলো।

— বাড়িতেই আছে। ওটার বিভিন্ন পার্টস তো সব লাগাতে হয়!

— আপনাদের আর কারো এ হবি ছিল না? কারও সঙ্গে আলোচনা হত না?

একটু ইতস্তত করে অর্জুন বললো— ন্ নাঃ।— তাড়াতাড়ি যোগ করল— আমার হবি এইসব গাছ পালা, পশুপাখি...আর দাদা? দাদা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে হিউম্যান। বড় তো! দাদা, অর্জুনের গলায় সামান্য আবেগ এসে যায়...দাদাই আমাদের তিন ভাইকে আগলে আগলে রেখেছে ছোট থেকে। য়ু নো হোয়াট আই মীন!

সুমনা কথা বললো না।

— বাবা মা যখন মারা গেলেন আমরা দিল্লিতে। আমাদের মামার বাড়ি কাছেই এখন যেখানে নয়ডা গড়ে উঠেছে। তখন সেরকম কিছু ছিল না। মামার বাড়িতে সামহাউ আমাদের কোনও আদর ছিল না। দাদাই তখন...সুমনা...আমাদের জীবনে যা কিছু স্নেহ মমতা, মূল্যবোধ আমরা দাদার কাছ থেকেই পেয়েছি।

— ঠাকুমার কাছ থেকে নয়?

অর্জুন একটু চুপ করে থেকে বললো— ঠাকুমার মধ্যে কতকগুলো ছেলেমানুষি আছে সুমনা, আশা করি বুঝতে পারছো। দাদা আরও অনেক ম্যাচিওর, লাভিং। ঠাকুমাকেই বা কে সামলায়? সান্ত্বনা দেয়? ওই দাদাই তো।

সুমনার হঠাৎ সরিতের একটা কথা মনে পড়ে গেল।— রাজেশ্বরী দেবীকে তুমি চেনো না। জানো না...। সে-ও কি তবে ওই ছেলেমানুষের দলেই পড়ে?

জোর করে নিজেকে আবার বর্তমানে ফিরিয়ে আনল সে। বললো— সারা রাত

বাড়ি এলো না, কেউ খোঁজ করলেন না!

অর্জুন বললো— তুমি আজকে ব্রেকফাস্ট কোথায় খেয়েছ?

— নিজের ঘরে।

— আমাদের ওইরকমই নিয়ম, ব্রেকফাস্ট ঘরে ঘরে যায়। লাঞ্চ টাইমের আগে বোঝাই যায়নি ও মিসিং। সকালে বাড়ি না ফেরাটাও ওর পক্ষে খুব অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। অনেক হবি ছিল। নিজের ইচ্ছেমতো স্টোর থেকে ফ্রিজ খুলে কিছু খেয়ে নিল।

সুমনা বললো— জল থেকে ও উঠতে পারলো না, একটা অ্যাথলিট— এটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না...অর্জুন...দা।

এতক্ষণ প্রদীপ অন্যদিকে ছিল। এবার তার গলা শোনা গেল।— হয়তো কুমিরটা ওখানেই... তখনই... তীব্র যন্ত্রণায় তার গলা আটকে গেল। সে দু হাতে মুখ ঢাকলো। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোখের জল বেরিয়ে আসছে। সুমনা আর পারছে না নিজেকে ধরে রাখতে। সে হঠাৎ গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলো রঞ্জন! রঞ্জন! ওহ্ হোয়াই? হোয়াই?

অর্জুন আস্তে আস্তে ওকে এসে ধরলো— সুমনা, দেখা তো হল, নিচে চল এবার।

প্রদীপ আগে আগে নেমে যাচ্ছে, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একবার। অর্জুন সুমনাকে ছেড়ে ছুটে গেল দাদার কাছে, খুব যত্নে ওঠালো— দাদা প্লিজ দেখে চলো।

অর্জুন আবার ফিরে গেল সুমনার কাছে।

সুমনা কান্না সামলিয়ে বললো— আমি ঠিক আছি। আপনারা প্লিজ চলে যান। আমি এখানে একটু একা থাকতে চাই। রতনলাল তো আছে!

অর্জুন বললো— তা হয় না। আমরা তোমাকে এখানে কিছুতেই একা ছাড়তে পারি না। জায়গাটা এখন ভালো নেই।

— ভয় নেই। সুমনা বললো— আমি সুইসাইড করতে যাচ্ছি না। সুবিচার খুঁজছি। জাস্টিস। রঞ্জনের জন্যে। সে যে ভাবেই হোক। প্লিজ...! আপনাদের কারো একবারও মনে হয়নি আমি স্ত্রী। আমার রাইট আছে। তাকে দেখবার। জানবার।

— ওহ গড, সুমনা— অর্জুন কাতর গলায় বললো— সে বীভৎস দৃশ্য তুমি তোমাকে...না...আমরা পারি নি। উচিত ছিল না। আই হ্যাভ নো রিগ্রেট ফর দ্যাট। অর্জুন যেন কিছুক্ষণের মধ্যেই সুমনার খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। সত্যিই হয়ে উঠেছে? না চেষ্টা? সে কি কিছু গোপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে? সুমনা এত সহজে ভোলবার পাত্র নয়।

দূরে গাঙচিল উড়ে যাচ্ছে। বহুদূরে একটা পালতোলা নৌকা। জঙ্গল থেকে এই দিনের বেলাও অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ উঠছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সুমনা। চোখ বুজিয়ে

প্রার্থনা করতে যায়। যিশুকে স্মরণ করতে যায় কিন্তু সমস্ত ছাপিয়ে ভেসে ওঠে একটা কুমির। পৌরানিক ড্রাগন বা লিভিয়াথানের মতো বিরাট, ভয়াবহ। একটা মানুষের পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সভয়ে চোখ খুলে সে বলে ওঠে— ওহ্‌ গড।

বাড়ি ফিরে সুমনা চলে গেল নিজের ঘরে। প্রদীপ আর অর্জুন ঢুকলো নিচের তলার পার্লারে। সেখানে দুই বউ খুব হাসিখুশি, গল্প করছে। সামনে টেবিলের ওপর তাস সাজানো। অর্থাৎ ওরা কিছুক্ষণ তাসই খেলেছে।

রাখী বলছিল— রঙ্গিলা টাইপের। আমার তো ফ্যানটাসটিক লাগত। অল্প দিনের মধ্যেই জমে গিয়েছিল।

শর্মিষ্ঠা বললো— আমি তো ওকে ভীষণ মিস করি। একেবারে অন্যরকম।

দু ভাই ঢুকলো। তাদের মুখ দেখে এদের হাসি উবে গেল।

কী হয়েছে তোমাদের? শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞেস করলো।

প্রদীপ ধপ করে বসে পড়ল। অর্জুন তার পাশে।

অর্জুন বললো— কী আবার হবে? তোমরা কখন ফিরলে টের পাইনি তো।

রাখী বললো— কী করে টের পাবে? শোকাকুলা ভ্রাতৃবধূ না কী বলে। তাকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত ছিলে।

— তুমি কি কখনও সীরিয়াস হবে না?— অর্জুন বিরক্ত হয়ে বললো।

রাখী গম্ভীর।— অর্জুন! অ্যাজ ইট ইজ তোমাদের ফ্যামিলিতে জীবনটা এমনিতেই খুব গুরুগম্ভীর গুমোট। চারদিকে যেন সব সময়ে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। তোমার ওই পাগলাটে ঠাকুমাকে যে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হচ্ছে, এটাই কি যথেষ্ট নয়? যখন শিলিগুড়ি কি দার্জিলিংয়ে থাকি তখন তো তোমার এ মুড দেখি না!

শর্মিষ্ঠাও ঝনঝন করে উঠল— ঠিক বলেছিস। এলাহাবাদে প্রদীপ একেবারে অন্য মানুষ। অর্জুনের মতো মিশুক নয়, রঞ্জনের মতো রংদার নয়। কিন্তু আমরা কত গান বাজনার আসরে যাই, ছবি দেখি। জানিস তো, তোর দাদা আবার লম্বা লম্বা কবিতা লেখে, শর্মি শর্মি করে পাগল করে দেয়। অথচ এখানে যেন চোখেই দেখতে পায় না। আচ্ছা প্রদীপ, এখানে তো যথেষ্ট তোমরা যাকে বল নেচার, পাখি-টাখি, গাছ-টাছ, এখানে এলে তোমার কবিতা শুকিয়ে যায় কেন বলো তো?

রাখী বললো— কেন আর? রাজেশ্বরী ঠাকুরাণীর আঁচে। ভালো নাম দিয়েছে রঞ্জনের বউ। ম্যাডাম। ভুলেও ঠাকুমা-টাকুমা বলে না।

এই সময়ে প্রবীর বললো— শর্মিষ্ঠা, রাখী ভুলে যাচ্ছো, ঠাকুমা আমাদের অত্যন্ত দুর্গত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে বুকে করে মানুষ করেছেন। অর্জুনের মনে থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের মা-বাবা সকলের অমতে বিয়ে করেছিলেন বলে মায়ের প্র্যাকটিক্যালি কেউ ছিল না। মামার বাড়িতে কী বলে...কেউ আমাদের মানুষে চোখে দেখত না।

শর্মিষ্ঠা শ্লেষের গলায় বললো— কেন? তোমাদের রাজরাজেশ্বরী ঠাকুমা? তিনিও তো ত্যাগই করে ছিলেন।

প্রদীপ বললো— হ্যাঁ করেছিলেন।

— এই কথায় কথায় ত্যাগ করাটা ওঁর খুব আসে। ছেলেকে ত্যাগ করলেন বিয়ে করলো বলে। নাতিকে ত্যাগ করলেন বিয়ে করলো না বলে। কত রঙ্গই দেখবো।

প্রদীপ বললো— আমার কথা শেষ করতে দাও। সে সময়ে ঠাকুমা নির্জনবাসী, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না।

— সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি, কেন?

প্রদীপ আনমনে বললো— এসব ঠাকুমার ব্যক্তিগত কথা। আলোচনা করা ঠিক নয়। উনি বড় অসুখী মানুষ। ঠাকুর্দা বোধহয়...তেমন...।

অর্জুন বললো— পরিষ্কার ভাবে বলেন নি কোনদিন। কিন্তু বাবাকে উনি খুব আঁকড়ে ধরে ছিলেন। সেই বাবা ওঁর অমতে বিয়ে করতে ভীষণ আঘাত পান।

শর্মিষ্ঠা বললো— হ্যাঁ স্নেহ, কিন্তু বাঘিনীর স্নেহ।

রাখী বললো— বাঘিনীও তো একটা বয়সের পর শাবককে চরে খেতে দেয়।

প্রদীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো— তোমাদের কিছু বোঝাতে যাওয়া বৃথা। কোনও লাভ নেই।

শর্মিষ্ঠা বললো— যাই বলো, তুমি যে ওঁর পেয়ারের নাতি হওনি, সেটা আমার লাক? ওরে ব্বাপ! রঞ্জন সইতো কী করে...

অর্জুন বললো— রঞ্জন ঠাকুমাকে দারুণ ভালোবাসতো। তোমরা ওই পারস্পরিক টানের প্রকৃতিটা কখনও বোঝোনি। ইউ আর ফুলস।

শর্মিষ্ঠা হালকা গলায় বললো— নিজের বউকে বলো যা খুশি, কিন্তু বউদিকেও তাই বলে ফুল-টুল বলবে?

অর্জুন বললো— স্যরি বউদি। ডোন্ট মাইন্ড। তবে রাখী হয়ত বেশি, তুমি একটু কম। তফাতটা ডিগ্রির।

এই সময়ে তেজস্বিনী ঢুকল।

রাখী বলে উঠলো— এই আরেকজন এলেন। ইন ইটারন্যাল মোর্নিং। কাম অন জিনি। এইসব ভেক ছাড়ো! ছেড়ে দাও তো! লীড আ নর্মাল লাইফ।

তেজস্বিনী উত্তর দিল না। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো— মেঘ জমছে। মনে হচ্ছে খুব বৃষ্টি হবে।

রাখী বললো— ইটস হাইটাইম।

তেজস্বিনীর গলায় শ্লেষ...বৃষ্টির মধ্যে এই হানাবাড়িতে আনইন্টারেস্টিং কতকগুলো মানুষের মধ্যে বসে থাকতে তোমার ভালো লাগবে?

একটু থেমে বললো— এই বৃষ্টির মধ্যে ওপার থেকে খাবার-দাবার, টাটকা-মাছ,

চিকেন, মাটন, হাঁসের মাংস বলেছিলেন, পার্কস্ট্রিট থেকে কেক। কী যে মুশকিল! ভালো কথা। অর্জুন ওই সুমনা মেয়েটি কিন্তু এখনও ফেরে নি।

— ওকে দেখো নি?

— অর্জুন বললো— দেখেছি।

— কোথায়?

অর্জুন তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললো— ভালুকটিলা।

— সে কী? কেন?

অর্জুন জিজ্ঞেস করলো— তোমার অসুবিধে আছে?

তেজস্বিনী একবার তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতে বললো— ডাকাতকে বলে টাকার সিন্দুক পাহারা দাও। ভালো রে ভালো। হেসে বাঁচি না।

প্রদীপ ভর্ৎসনার সুরে বললো— ডোন্ট বি ভালগার শর্মি।

রাখী বললো— আই বেট দাদা। রঞ্জনের বউকে একা পেলে জিনি—

তার কথা শেষ হল না। অর্জুন চিৎকার করে বলে উঠলো— আঃ।

১৭

কড়কড় করে বাজ ডেকে খুব ধুমধাম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় সত্যিই। চারদিক ঝাপসা হতে হতে কিছু আর দেখা যায় না। গাছপালা, আকাশ, নদী সব একইরকম ধূসর রঙের। জানলার ধারে বসে বসে বৃষ্টি দেখে সুমনা। একেবারে হারিয়ে যায়। বৃষ্টি! বৃষ্টি, বজ্রপাত, শীত, আকাশ, জঙ্গল, নদী এসব একরকম রয়ে যায়। নিয়মে চলে। পরিবর্তনহীন। খালি মানুষ, মানুষের জীবন বদলে বদলে যায়। এখন টুকটুক কী করছে? সিস্টার জেনের কাছে? না কি সরিৎদা ওকে বাড়ি নিয়ে গেছে। সরিৎদার মাকে ও দিমা বলে। উনি খুব ভালোবাসেন টুকটুককে। ওখানে গেলে টুকটুক মাকেও ভুলে যায়। টুকটুক, তোর বাবার খুনের কিনারা করতে এসে যদি আমি নিজেই খুন হয়ে যাই? আর আমাকে দেখতে পাবি না। তো মায়ের মতোই অনাথ, একলা হয়ে যাবি। না না। সরিৎদা থাকতে তুই কখনও, কিছুতেই অনাথ হবি না। এই বিশ্বাস আমার আছে। তাকে নিবৃত্ত করবার জন্যে সরিৎদা কী না করেছে। শেষকালে এ-ও বলেছে, সুমনা। তোমার কি শেষে রাজেশ্বরী দেবীর সম্পত্তির লোভ হল? টুকটুক কেন ও সম্পত্তি নেবে? ওর জন্যে তুমি কি যথেষ্ট নও? আমি? আমি কি নেই?

ক্রমে রাত হচ্ছে। আজ লাঞ্চের সময়েও রাজেশ্বরী অনুপস্থিত ছিলেন। ডিনারের সময়ে তো সুমনা যায়ই নি। রতনলাল তার খাবার এনে দিয়েছিল। পরে তেজস্বিনী এসে একবার খোঁজ নিয়ে যায়।

বৃষ্টির ছাট আসছে। জানলা বন্ধ করে সুমনা। কোথা থেকে পিয়ানোর বাজনা ভেসে আসছে না? অপূর্ব বাজনা। সে চার্চ কয়ারে যা বাজাত সেগুলো সবই ক্যারল বা সাম। এই বাজনাটা শুনতে শুনতেই সে বুঝতে পারে এটা বোধহয় কোনও ক্লাসিক্যাল নাম্বার। সে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বেঠোফন, মোৎসার্ট কী! মোৎসার্টের কী! সে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। করিডর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে তার রাত পোশাকেই। চোখে উদাস ভাব। সব দরজা বন্ধ। প্রত্যেক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে কান পাতে। অবশেষে একটা ঘরের দরজার ওপর টোকা দেয়। দরজা খুলে দেয় শর্মিষ্ঠা। অবাক হয়ে গেছে। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। কিন্তু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে ইশারা করে। জানলার দিকে মুখ করে একটা নিচু চৌকিতে বসে প্রদীপনারায়ণ। তার হাতে সরোদ। গভীর কোনও সুরে বাজছে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে যাচ্ছে সরোদ। মাঝে মাঝে মিশে যাচ্ছে। শর্মিষ্ঠা তাকে বসতে ইঙ্গিত করে। সুমনা দাঁড়িয়েই থাকে। দাঁড়িয়েই থাকে। দাঁড়িয়েই থাকে কিছুক্ষণ পর সে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুর তবু ছাড়ে না, কোথাও আরও একটা ঘর থেকে সুর ভেসে আসছে। সে আন্দাজে আন্দাজে

পনেরো নম্বর ঘরে এসে পৌঁছোল, টোকা মারলো। দরজা খুলে দিল গীতা নামে নার্সটি। উল্টো দিকে পিয়োনোয় বসে রাজেশ্বরী। আঙুলগুলো উঠছে পড়ছে। অপূর্ব সুরলহরী বেরোচ্ছে। সে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর চেয়ার ঘুরিয়ে তার মুখোমুখি হলেন রাজেশ্বরী।

সুমনা বললো— মুনলাইট সোনাটা বাজাচ্ছিলেন?— তার স্বর আর্দ্র। সে এখন চিনতে পেরেছে সুরটা।

ঘাড় নাড়লেন উনি।

— তুমি ভালোবাসো?

সে ঘাড় নাড়লো— সামান্য বাজাতাম। চার্চ কয়্যারে। শেখার ইচ্ছে ছিল। আমাদের ছোট্ট সংসার। পিয়ানো কেনার ক্ষমতা ছিল না তো!

রাজেশ্বরী নরম গলায় বললেন— সুমনা, মাই-ব্রেভ গার্ল! তুমি আমার পাঠানো টাকা ফিরিয়ে দিলে কেন? প্রত্যেকবার পাঠিয়েছি। প্রত্যেকবার ফেরৎ পাঠিয়েছো।

সুমনা নালিশহীন গলায় বললো— ও জীবিত থাকতে আপনি তো আমায় মেনে নেননি! কীভাবে নেবো?

— আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইয়োর স্পিরিট। কিন্তু মাই গার্ল, বিশ্বাস করো প্রথমটা খুবই রাগ হয়েছিল। তারপর যখন প্রদীপ এসে বললো— ভারী চমৎকার, হাসিখুশি, আন্তরিক ধরনের মেয়ে তখন...তখন আমি বারবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমায় আসতে বলেছি। সে চিঠি কেন পৌঁছলো না? মিস্ট্রি। অনেক অনে-কগুলো জট বেঁধে রয়েছে। কী করে যে খুলি?

— দাদা আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন? আমি তো বুঝতে পারিনি।

— অনে-কবার। প্রদীপ তোমাকে খুব স্নেহ করেছিল। আমি প্রদীপের জাজমেন্টে বিশ্বাস করি। তোমার ছবি আছে আমার কাছে। একেবারে বাচ্চা, এখন তো অনেক বড়, রাগী হয়ে গেছ। তখন একটা হরিণছানার মতো ছিলে...কে? কে? এই জট পাকালো! আমার সুখের সংসার কে ভাঙল? কে? কে?...

উনি নিজের রগ টিপে ধরলেন। চোখ বোজা। বোঝা যাচ্ছেনা এই অন্ধকারে উনি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছেন, না নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন। গীতা ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে।

সুমনা বেরিয়ে এল। এখনও কোথা থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীত। পিয়ানো নয়। অরগ্যান। সুমনা স্বপ্নচালিতের মতো চলেছে। কোন ঘর? কোন ঘর! শব্দ অনুসরণ করে সে আরেকটা ঘরের সামনে দাঁড়ায়। কান পেতে শোনে। অরগ্যান বাজছে ঝড়ের মতো, তার পরেই আছড়ে পড়ছে কান্না, কেউ হাহাকার করে কাঁদছে।

— এ কী সুমনা? তুমি এত রাতে? এখানে? তার সামনে অর্জুন দাঁড়িয়ে।

— কার ঘর এটা? মিউজিক শুনলাম...

— এটা তো জিনির ঘর। ...কোনও কোনও দিন রাতে এমনি বাজে। দাদা বাজায়, ঠাকুমা বাজান, জিনি বাজায়, রঞ্জন...রঞ্জনও বাজাতো ফ্লুট। আমি ভালোবাসি মাউথ অরগ্যান। উই আর আ মিউজিক্যাল ফ্যামিলি। কিন্তু এত রাতে এমন একা একা বেরিয়ে ঠিক করো নি। যাও, ফিরে যাও। চলো আমি যাচ্ছি।

সুমনা যন্ত্রচালিতের মতো এসে ঘরে ঢুকলো। আলো জ্বাললো, তারপরেই চিৎকার— একটা সাপ তার খাটের ওপর ফণা তুলে দুলছে।

অনেক পায়ের শব্দ, চিৎকার...তার দরজায় দমাদম ধাক্কা।

মেঘ কেটে রোদ উঠছে। গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে নানান ভঙ্গিতে রোদ এসে পড়েছে বনভূমির ওপর। গাছের পাতায় এখনও টলটল করছে জল। টুপটাপ ঝরে পড়ছে। সুমনা চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলো। সে কি স্বপ্ন দেখেছিল? ভৌতিক বারান্দা! ঘরে ঘরে সরোদ। পিয়ানো অরগ্যান...অর্জুন...সাপ? না ওই তো ক্যাম্প খাট। বাকি রাত গীতাদি শুয়েছিল। কে তার ঘরে সাপ ছেড়ে দিল? রাজেশ্বরী? উনি তো পিয়ানো বাজাচ্ছিলেন! তাতে কি। ওঁর হুকুমও তো হতে পারে। কিন্তু তাহলে অত ভালো ব্যবহার করলেন কেন? মানুষটাকে চেনাই যাচ্ছিল না। যেন অন্য রাজেশ্বরী! অভিনয়? হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়ালো— অর্জুন অতরাত্রে কী করছিল করিডরে? তার ঘরের দিক থেকেই তো আসছিল। টুকটুক ওদের একমাত্র বংশধর। তবে কি ওরা তাকেই মারতে চাইছে? তাকে মারলেই টুকটুক ওদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। চেঁচিয়ে সে বলে উঠলো— না! না!

দরজা খুলে তেজস্বিনী ঢুকলো।

— ঠিক আছো তো? চিৎকার শুনলাম যেন! তার গলা খুব নরম।

— হ্যাঁ ঠিক আছি।

— জঙ্গুলে জায়গা তো!— একটু ইতস্তত করে তেজস্বিনী বললো— সাপ খোপ, বিছে, জোঁক এসব আছেই। তার ওপর কাল অত বৃষ্টি। সাপ দেখলে কিন্তু ওরকম রি-অ্যাক্ট করতে নেই। একদম স্থির হয়ে যেতে হয়। হয়ত মিউজিক শুনে চলে এসেছিল। কাল ঠাকুমা পিয়ানোয় বসেছিলেন। দাদাও...

সুমনা কঠিন গলায় বললো— সাপের কান নেই, আমি জানি।

তেজস্বিনী বললো— মিউজিক শুনলে তো অনেক সময়েই...

— ওরা মুভমেন্ট দেখে আবছা, শব্দ শুনতে পায় না।

— হতে পারে। তাই বোধহয় নড়াচড়া করতে বারণ করে। তুমি কি দরজা একেবারে খুলে রেখে বাইরে বেরিয়েছিলে?

— হ্যাঁ, খুব ভালো বাজাচ্ছিলেন কেউ। আমার জ্ঞান ছিল না। পিয়ানো ছাড়াও শুনলাম, সরোদ আর অরগ্যান...

তেজস্বিনী শুকনো মুখে বললো— স্যরি ফর অল দা ট্রাবল। ভাগ্যে সাপটা তোমার নাগাল পায়নি! হলে যে কী হত। অর্জুন ছাড়া কেউ সাপের মোকাবিলা করতে পারে না।

— অর্জুন কি সাপুড়ে?

— বলতে পারো। ও সাপ ধরতে পারে। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, ব্রেকফাস্ট আসছে দশ মিনিট।

সুমনা বললো— আমি এখন চান করতে ঢুকবো। আধঘণ্টা অন্তত লাগবে।

— ঠিক আছে। তেজস্বিনী দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

সুমনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললো— ও, তাহলে তুমি ভেবেছ সাপ মিউজিক শুনলে আসে, সেইসব অর্ফিয়ুস-টুসের রূপকথা শুনিয়ে আমাকে ভোলাবে। আর আমি বোকা, ভুলে যাবো। যতই বাজাও। যতই দরজার ভেতরে থাকো। তুমিও পারো, তোমারও স্বার্থ আছে।

ক্রমশ আকাশ পরিষ্কার। ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে সুমনা। ঘরের দরজা খোলা, পর্দা টানা আছে। শর্মিষ্ঠা, রাখী একসঙ্গে ঢুকলো।

— গুড মর্নিং। ঠিক আছো তো?

— হ্যাঁ ঠিক আছি। থ্যাংকিউ। সুমনা বললো।

শর্মিষ্ঠা একটা চেয়ারে বসে বললো— বাব্বা, আমরা এত ভয় পেয়ে গেছিলাম। কী ভাগ্য সাপটা ছোবল না দিয়ে পালিয়ে গেল। তুমি যা চিৎকার করেছিলে!

সুমনা বললো— সাপে শুনতে পায় না।

রাখী বললো— তাই বুঝি? সে যাই হোক, খুব বেঁচে গেছ। অর্জুন বলছিল চন্দ্রবোড়া। আমরা এতদিন এখানে আশা যাওয়া করছি, বাড়ির ভেতর কখনও সাপ দেখিনি। জোঁক বিছে অঢেল, কিন্তু সাপ! কাল রাত থেকে খুব কার্বলিক অ্যাসিড দেওয়া হচ্ছে।

শর্মিষ্ঠা বললো— যাক, যে জন্য আসা। ঠাকুমার আজ জন্মদিন। উইশ করেছো?

— না।

— করো, বুড়ি মারাত্মক হার্ট হবে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওরা চলে যায়। সুমনা মনে মনে বলে— ঘরে কখনও সাপ দেখো নি! দেখবে কী করে? কেউ ছেড়ে গেলে তবে তো দেখবে? সবাই মিলে এই ষড়যন্ত্র করছো কিনা তাই বা জানবো কী করে? তবে যেই হও তুমি বা তোমরা আমি নিশ্চিত যে তুমি বা তারাই রঞ্জনকে খুন করেছো। খুব সম্ভব সম্পত্তির জন্যে। ঠাকুমার সম্পত্তির মেজর শেয়ার যদি রঞ্জন পেয়ে যায়? অথচ-অথচ...সম্পত্তির জন্য রঞ্জনের কোনও লালসা ছিল না। শেষের দিকে একটা ভীষণ বিপন্নতা বোধ জেগেছিল। ও তো কখনও ওভাবে থাকেনি। কী করবে, নিজের অভ্যেসের হাতে নিরুপায়। ও বলতো, জাত-ধর্ম, অনাথ-টনাথ আমি মানি না। তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকেই বিয়ে করেছি। তবে তোমার আর টুকটুকের হক, তোমাদের সম্মান আমি ছিনিয়ে আনবোই।

চান করতে করতে সে বলে, সরিৎদা! ইউ ওয়ার অ্যাবসল্যুটলি রাইট। আমি

কেন এখানে মরতে এলাম? টাকার লোভে নয় তো? বা বংশমর্যাদার লোভে? আমার মেয়ে শাকম্ভরীর মুখার্জি বংশের সন্তান! যদি লোভই হয়? আমি টুকটুকের বংশের দোহাই-ই তো দিয়েছিলাম। সরিৎদা কত বারণ করেছিল। ইশশ্, সুমনা, তুমি শেষ পর্যন্ত লোভের চোরা ফাঁদে পড়ে গেলে?

হাউজকোটটা গলাচ্ছে। দরজায় আবার টোকা। বিরক্ত হয়ে সে বললো— কে?

— আমি তেজস্বিনী।

সুমনা দরজা খুলে দেয়। তেজস্বিনী একটা বড় বাকস্ রাখে বিছানার ওপর— স্যরি টু ডিসটার্ব য়ু। এর মধ্যে তোমার ড্রেস আছে। গয়না। ঠাকুমা পাঠিয়েছেন।

সুমনা কিছু বলতে যাচ্ছিল। তেজস্বিনী বললো— শুধু তোমাকে নয়। আমাদের প্রত্যেককে নিজের জন্মদিনে উনি গিফট্ দ্যান। ওঁর প্রজাদের খাওয়ান, যার যা প্রয়োজন শোনেন। লঞ্চ ওঁকে নিয়ে চলে গেছে। এরাও সঙ্গে গেছে। আমি, রাখী আর শর্মিষ্ঠা এবার চলে যাবো। রতনলাল তোমার কাছে রইল। হরিহরও আছে। ভয় পেও না। যখন যা দরকার হবে বলবে। যদি বাজাতে চাও তো ওঁর ঘরের চাবি রেখে গেছেন, পিয়ানোয় বসতে পারো। রাত ন'টায় ডিনার। তার আগে হয়ত আর দেখা হবে না।

তেজস্বিনীর জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেলে সে দরজা বন্ধ করে দিল! বাক্সটা খুলল। ঝলমল করে উঠলো জরি-চুমকি-পাথর বসানো লেহেঙ্গা চোলি, ওড়না। নীল ভেলভেটের বাক্সে নিখাদ হীরের গয়না।

১৯

ঘরটা ঝলমল ঝলমল করছে আজ। এত আলো ছিল এ ঘরে জানা ছিল না। সিলিং থেকে নানা রকমের উইন্ড চাইম, রুপোলি সোনালি তারা ঝোলানো হয়েছে। নানান জায়গায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। ঠাকুমার আসনের পাশে একটা টেবিলের ওপর ট্রেতে, দুটো তিনটে গোছায় সাজানো আছে কার্ড। এক এক করে দুই ছেলে ঢুকলো ডিজাইনার পাঞ্জাবি ও চোস্ত পায়জামা পরে। সত্যিই রাজকুমারের মতো দেখতে লাগছে। বড় বউ শর্মিষ্ঠা জমকালো জরিদার শাড়ি। ছোট বউ লেহেঙ্গা চোলি। দুজনেরই সর্বাঙ্গে ম্যাচিং গয়না। রাজেশ্বরী ঢুকলেন তাঁর হুইল চেয়ারে। পরনে সেই একইরকম ঘিয়ে শাদা সিল্কের শিফন, তফাতের মধ্যে আজ পাড়টা সোনালি জরির। গীতাও ভালো সিল্কের শাড়ি পরে সেজেছে। তেজস্বিনীকে আজ চেনা যাচ্ছে না। তার সেই দৈনন্দিন কালো নয়। আজ সাদা জর্জেট তার অঙ্গে, সরু হিরের কণ্ঠি। হাতে মস্ত বড় হীরের আংটি। তার থেকে আলো ঝলকাচ্ছে। কানেও ছোট ছোট জ্বলজ্বলে হীরে। তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। সব শেষে রতনলালের সঙ্গে ঢুকলো সুমনা। চৌকাঠ পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়ে রতনলাল চলে গেল। সে রাজেশ্বরীর দেওয়া কোনও পোশাক বা গহনা পরেনি। কালো শিফন শাড়ি, ব্লাউজ। কানে গলায় হাতে অকসিডাইজ্‌ড্ ধাতুর গয়না। লকেট কালো। সকলেই এমন আশ্চর্য হয়ে গেছে যে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র রাজেশ্বরীর কোনও ভাবান্তর নেই। বললেন— ওয়েলকাম সুমনা।

সুমনা এগিয়ে এসে হাত জোড় করে নমস্কার করল, কিন্তু কোনও শুভকামনা জানাল না। আজ তার ঠিক উল্টো দিকেই তেজস্বিনী। তাদের দুজনের পাশেই একটা করে খালি চেয়ার। টেবিলে রুপোর প্লেট কাঁটা চামচ ছুরি সব সাজানো। এগুলো কাদের জন্য?

হঠাৎ সব আলো নিভে গিয়ে মোম জ্বলতে লাগল। দেয়ালগিরিতে জ্বলছিলই। সেগুলোই জ্বলছে। মায়াময় হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। রাজেশ্বরীর গলা শোনা গেল।

— সুমনা আজ তোমার ডিনার পূর্ব প্রার্থনা করো, আমরা শুনবো, যোগ দেবো। আই লাইক ইট।

সুমনা মাথা নিচু করে বললো— হে ঈশ্বর আজকের এই অন্নজল যে দিয়েছো তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

রাজেশ্বরী বলে উঠলেন— আশি বছরের যে সুখদুঃখময় জীবনকাল দিয়েছ...

হঠাৎ কঠিন গলায় বলে উঠলেন— তার জন্যে তোমায় আমি অভিসম্পাত করি। অভিসম্পাত করি। আই কার্স য়ু ফ্ এভার য়ু আর।

সকলে চমকে উঠলো।

— গীতা কার্ডগুলো কারা পাঠিয়েছে। মোটামুটি পড়ে শোনাও। আমার হাতে দাও।

গীতা একটা করে কার্ড কর্ত্রীর হাতে এগিয়ে দেয়। প্রেরকের নাম বলে, রাজেশ্বরী পরিচয় দ্যান।... প্রদীপ তোমার শ্বশুর শাশুড়ি।... রাখী তোমার বাবা-মা।... কলকাতার শিশুতীর্থ অরফ্যানেজ।... মধুপুরের বৃদ্ধাবাস। সৈয়দ আহমদ হাসান, ঢাকার ক্লোদস এক্সপোর্টার।... গগন মেহতাব মণ্ডল, সন্দ্বীপের জমিদার। মিঃ ভানপ্রতাপ বরজাতিয়া স্টীল...আশুতোষ শেঠি, কপার কিং...গোটা কুড়ি পড়বার পর কর্ত্রী বললেন— আর গুলো পরে দেখবো, নিয়ে যাও। নাও তোমরা খাওয়া শুরু করো।

খেতে খেতে নিচু গলায় কথাবার্তা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে। তেজস্বিনী সবাইকে একটা করে কেকের টুকরো দিল। সুমনাকে বললো— এটা আসে। আসলে পার্ক স্ট্রিটের কনফেকশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অনেকগুলো বিশাল কেক পাঠায়। বেশির ভাগটাই আমরা প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দিই। নিজেদের জন্য জাস্ট একটু রেখে দিই। কেক কাটা জন্মদিন উনি পছন্দ করেন না।

সুমনারও স্বাভাবিক গলায় বললো— ও। কোনও প্রশ্ন করল না এ নিয়ে। বরং বললো— আগের দিন একটা ক্রিম দিয়ে চিংড়ি হয়েছিল। সেটার রেসিপি তোমার কাছে চাইবো ভাবছিলাম।

— নিজের জন্য না তোমার হোটেলের জন্য?

সুমনা বললো— হোটেল— সে একটু হাসলো। শেফকে অবশ্য একটু গুছিয়ে বললেই ধরে নেবে। আসলে তেজস্বিনী একটু সহজ হতে চেষ্টা করছে। সুমনার মনে হল তারও চেষ্টা করা উচিত। নানারকম তাজা ফল ও শুকনো ফলের একটা অসাধারণ আইসক্রিম এল শেষে। তার ওপর গরম চকো-সস।

— এটাও খুব ভালো, সুমনা বললো— ওয়াইন দিয়েছো, না?

তেজস্বিনী হাসলো— তুমি তো অনেক কিছুই জানো।

হঠাৎ রাজেশ্বরীর গলা গমগম করে উঠলো। তোমাদের আমার কিছু বলবার আছে।

— সুমনা, জিনি, প্রদীপ, অর্জুন রাখী, শর্মি, তোমরা আমার সবচেয়ে নিকটজন। এবং ঈশ্বর, যদি থাকো তো, তুমি আরও বড় আত্মীয় কেন না আমি তো তোমার থেকেই উৎপন্ন হয়েছি, লোকে বলে থাকে। আজ আমার জন্মদিন। আশি বছর পার হয়ে গেল। ভালো কথা, খুব ভালো। আমি বলবো না অনেক হয়েছে এবার আমার চলে যাওয়াই ভালো। আবার এও বলবো না আমাকে বাঁচতে দাও আরও আরও। নিজের জন্যে কোনও খেদ, কোনও দুঃখ আমার নেই। নো রিগ্রেটস। যতদিন বেঁচেছি রাজার মতো বেঁচেছি। বহু সম্পত্তি নাড়াচাড়া করেছি, বহুজনের উপকার করেছি। অন্য

যে কোনও শিল্পপতি বা মন্ত্রীশাস্ত্রীর থেকে অনে-ক বেশি জনকল্যাণের কাজ আমি করেছি। কিন্তু বারবার, বারবার আমার এই জীবন অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখেছে অতি আপনজনের। এ কি আমার পাওনা ছিল?— চোখ ওপরের দিকে তুলে বললেন— আমি তখন ১৪ বছরের আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাই জলে ডুবে গেল— এ কিসের শাস্তি? বিবাহ হল, আজ আর বলতে বাধা নেই, এক হিংস্র, দুশ্চরিত্র, বদমেজাজি মেজরের সঙ্গে। একটিমাত্র সন্তান পেলাম। আমার সমস্ত যত্ন, ভালোবাসা, ক্ষমতা দিয়ে তাকে বড় করলাম। বীভৎস এ্যাকসিডেন্টে সে চলে গেল। কেন? কিসের পাওনা? জবাব দাও। সৌভিক। আশা করি এসেছো, আশা করি তোমার জন্য সাজানো আসনে তুমি বসেছো আজ। আমার সবচেয়ে বাধ্য, বিবেচক, চমৎকার মেজাজের নাতি, জবাব দাও তুমি কেন আত্মঘাতী হলে? তেজস্বিনী ভাটিয়া, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর নিজের মেয়ের মতো তোমাকে মানুষ করেছি, তোমার বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করলে তার আঁচটিও লাগতে দিইনি তোমার গায়ে। আজ এই সবার সামনে বলো সৌভিককে কেন আত্মঘাতী হতে হল। সৌভিক বসে আছে তোমার পাশে, তোমার জবাব শুনবে বলে। আর তোমার সামনে বসে আছে আমার প্রাণপ্রিয় রঞ্জন, তাকে তুমি কেন হত্যা করলে? কী করে করতে পারলে? এই জিঘাংসা কিসের? আর কাল রঞ্জনের স্ত্রীকেই বা হত্যা করতে গিয়েছিলে কেন?

একটা হইচই উঠলো ভীষণ। পটপট করে কয়েকটা আলো জ্বলে উঠলো। তেজস্বিনীর পুরো ব্যক্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। সে মুখ ঢেকে কাঁদছে। মাথা নাড়ছে আর তুমুল কাঁদছে।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে জোর গলায় বলে উঠল— ঠাকুমা আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শোক দুঃখ সবই মানছি। তাই বলে এইভাবে বিনা কারণে জিনির মতো একজন আনফর্চুনেট মেয়েকে...ছি। ছি!

— ধিক্কার দিচ্ছো অর্জুন? রাজেশ্বরী বললেন— ধিক্কার আমিও দিতে পারি। রঞ্জনের ডেডবডি আমাকে দেখালে না কেন? তড়িঘড়ি পুড়িয়ে দিলে! রঞ্জনের বউয়ের কাছে সে খবর পাঁচ দিন পর পৌঁছলো কেন? প্রত্যেককে অন্ধকারে রাখতে চেয়েছো। তুমি কী ভাবে জানতে পারলে আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি রঞ্জনের জন্য রেখে যাচ্ছি? কীভাবে জানলে এখন সেই অর্ধেক যাবে রঞ্জনের স্ত্রী-কন্যার কাছে। কে সুমনার ঘরে সাপ ছেড়ে এসেছিল? জিনির ঈর্ষা থাকতে পারে, কিন্তু সাপুড়েদের সঙ্গে কারবার তো তোমারই!

রাখী ফুঁসে উঠল এবার— য়ু ওল্ড হ্যাগ। এইভাবে আমার স্বামীকে অপমান করবার... তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার সাহস তোমার কী করে হয়! অর্জুন আমি বরাবর বলে আসছি দিস ওল্ড লেডি ইজ ম্যাড। বদ্ধ উন্মাদ...

রাজেশ্বরী গলার মধ্যে হাসলেন— সো সো বউ রাখীও তোমার সঙ্গে আছে?

রাখী জানে না। রঞ্জন জিনিকে রিফিউজ করে চলে যাবার পর অর্জুনের খুব আশা হয়েছিল ও-ই জিনিকে পাবে। কার্টেসি ঠাকুমা। নয় অর্জুন? তার জায়গায় সৌভিক বাধ্য, ভদ্র, সংযত সৌভিক পেল জিনিকে। আর তুমি পেলে একটা রঙচঙে পুতুল!

অর্জুন বললো— আপনি সত্যিই একেবারে পাগল হয়ে গেছেন ঠাকুমা। রাখী চলে এসো।

অর্জুন মোটামুটি শান্ত, কিন্তু রাখী চলে গেল তাঁকে শাসাতে শাসাতে। বাবাকে বলে সে এর শোধ নেবে।

উঠে দাঁড়ালো শর্মিষ্ঠা ও প্রবীরও।

— তোমরাও সন্দেহের উর্ধ্বে নও মাই ফার্স্ট গ্র্যান্ড ডটার ইন ল অ্যান্ড হার হাসব্যান্ড। তথাকথিত আভিজাত্যের আড়ালে তোমার ক্রুর, কুটিল মনের পরিচয় আমি পেয়েছি শর্মিষ্ঠা। তোমার স্ত্রৈণ স্বামীটিকে দিয়ে তুমি যা খুশি করাতে পারো, তাও আমি জানি। তবে জেনে রেখো। এখন আর কিছু করার নেই। উইলটা আমার করা হয়ে গেছে। একেবাবে পরিষ্কার লীগ্যাল ডকুমেন্ট, আমার সলিসিটরের ঘরে।

শর্মিষ্ঠা ক্রুদ্ধ ভয়ংকর গলায় বললো— আপনার ব্লাস্টেড সম্পত্তি আপনারই থাক। উই আর নট ইনটরেস্টেড, প্রদীপ লেটস গো-ও!

প্রদীপ এগিয়ে এসে জিনির কাঁধে হাত রাখলো, ভিজে গলায় বললো— জিনি, শান্ত হও, প্লি-জ কাম ডাউন। তুমি তো সবাইকেই জানো। কত বুদ্ধিমতী, কত ভালো মেয়ে তুমি, শর্মি তুমি ওকে একটু হেলপ্ করো।

চুলে মুখ প্রায় ঢাকা সর্বাঙ্গে কাঁপুনি তেজস্বিনী প্রদীপ ও শর্মিষ্ঠার সঙ্গে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমনা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল সে কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ একটা ধূর্ত হাসির শব্দে তাকিয়ে দেখল রাজেশ্বরীর মেজাজ সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। কোথায় সেই রাগ। ধিক্কার, অভিযোগ! বললেন— কী সুমনা, এইজন্যেই তো এসেছো! স্বামীর অপঘাত রহস্যের কিনারা করতে! নাউ উই আর ইন ইট টুগেদার। আই লাইক ইয়োর গাটস। কোনও ন্যাকামি নেই, ভান ভড়ং, ভেরি ইনটেলিজেন্ট। তোমাকে কালো পোশাকে দেখাচ্ছে ঠিক রঞ্জনের বিধবাকে যেমন দেখানো উচিত। ওদের কেমন ভয় পাইয়ে ঘেঁটে দিলাম দেখলে তো? এইবার খেল শুরু। দেখো কী হয়।

সুমনা নিজের গলার আওয়াজই খুঁজে পাচ্ছিল না। অনেক চেষ্টায় বললো— আপনি যে দুজনকে সোজাসুজি অ্যাকিউজ করলেন সত্যিই কি ওদেরই কেউ?

রাজেশ্বরী বললেন— মাই গার্ল। সন্দেহ থেকে আমি কাউকে বাদ দিচ্ছি না। এদের সবারই সুযোগ ছিল, মোটিভ ছিল। আজ যেমন আমার জন্মদিন, তেমন রঞ্জনেরও মৃত্যুদিন...

তিন বছর আগে এই দিনেই...। অ্যান্ড ইটস গডস ট্রুথ আমি তোমাকে রঞ্জনের সঙ্গে ডেকে পাঠিয়েছি। এখানে তোমার অভ্যর্থনার সব ব্যবস্থা আমি করেছিলাম।

সুমনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো— এটা যে আপনার জন্মদিনও আমি জানতাম না।

— স্ট্রেঞ্জ। আমার জন্মদিনটা রঞ্জন তোমাকে বলে নি?

এই সময়ে হঠাৎ বাইরে একটা প্রচণ্ড গোলমাল উঠলো।

গীতা ছুটতে ছুটতে এসে বললো— একজন উটকো লোক দ্বীপে নেমেছে, কখন জানি না। শাকম্ভরীর মন্দিরে লুকিয়ে ছিল। রাতে বাইরে বেরোতে গার্ডরা ধরে এনেছে।

যাকে নিয়ে বেশ কয়েকজন লোক ঢুকলো সে আর কেউ নয়, সরিৎ।

সুমনা বলে উঠলো— সরিৎদা! এ কী! তুমি?— সে আশ্চর্য হয়ে গেছে।

সরিৎ বললো— হ্যাঁ গতকালই আমি বৃষ্টির মধ্যে পৌঁছেছি।

— কেন?

— কেন? য়ু আর ইন গ্রেভ ডেঞ্জার সুমনা!

রাজেশ্বরী কর্কশ গলায় বললেন— কে তুমি? তোমার সাহস হয় কী করে আমার অনুমতি ছাড়া দ্বীপে ঢোকার? আমার নাতবৌকে ভয় দেখাবার তুমি কে? গ্রেভ ডেঞ্জার! হুঁঃ!

সরিৎ শান্ত গলায় বললো— আপনার নাতিরা প্রদীপদা, অর্জুন সবাই আমায় চেনে। আমরা এক স্কুল কলেজে পড়েছি। আমি রঞ্জনের ক্লাসমেট, বন্ধু।

রাজেশ্বরী বললেন— গীতা! হরিহর, প্রদীপ, অর্জুনবাবুকে ডাকো শিগগিরই।

সুমনা বললো— এটা তুমি ঠিক করো নি সরিৎদা। বলিনি আমার ওপর ভরসা রাখো।

সরিৎ বললো— কথা ছিল, একদিন বড় জোর দুদিনের। তোমার আশা-মতো কোনও লঞ্চও ক্যানিং-এ ছিল না। এতটা ঝুঁকি নেওয়ার জেদ করলে— আমারই বা কী উপায়?

এই সময়ে প্রদীপ ও অর্জুন ঢুকলো। প্রদীপ বলে উঠলেন— আরে সরিৎ না? সরিৎ বিশ্বাস?

— যাক প্রদীপদা আমাকে চিনতে পেরেছেন— ম্যাডাম এই আমার আইডেনটিটি কার্ড পেশ করছি। অর্জুন এসে তার কাঁধে থাবড়া মেরে বললে— তুমি কখন এলে সরিৎদা?

সরিৎ বললো— প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড অর্জুন, তোমাদের ফ্যামিলি থেকে এই মেয়েটির জীবনে এত দুঃখ, দুর্দৈব এসেছে যে আমি ওকে একা ছেড়ে দিতে সাহস পাইনি। মেনল্যান্ডেই ছিলাম। কাল ধুন্ধুমার বৃষ্টি দেখে ভাবলাম আর দেরি করা ঠিক না একটা লঞ্চকে প্রচুর জপালাম, নামিয়ে তো দিল!

রাজেশ্বরী ডাকলেন— গীতা!

গীতা এলে হুকুম দিলেন— এক্ষুনি যেন এই ভদ্রলোককে গেস্টরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। তার যেন কোনও অযত্ন না হয়।

সরিৎ বললো— আ অ্যাম স্টার্ভিং...ম্যাডাম। কিছু খাবার দাবারের হুকুম করুন।

সরিৎ গীতার পেছন পেছন চলে গেল। অর্জুনও কথা বলতে বলতে গেল, পেছনে প্রদীপ। সবাই চলে গেলে রাজেশ্বরী সুমনার দিকে ঘুরলেন।

— এই ছেলেটি কে?

— শুনলেন তো রঞ্জনের ছোটবেলার বন্ধু।

— তোমার সঙ্গে কী সম্পর্ক?

— ওই! রঞ্জনের বন্ধু। ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। এক জায়গায় কাজ করি আমরা।

রাজেশ্বরী সন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। গম্ভীরভাবে বললেন— গুড নাইট!

সুমনা নিজের ঘরে চলে এসেছে বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু সে এখনও শোবার জন্যে প্রস্তুত নয়। আজকের তুমুল সব ঘটনায় সে বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত। ঘরে কৌচের ওপর এলিয়ে বসে রয়েছে। চোখের দৃষ্টি শূন্য। ঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইরে ঝিঁঝির ডাক। জোনাকি জ্বলছে, নিবছে। একটা প্যাঁচা বিশ্রী চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। কাকেদের আর্তনাদ। অজানা কোনও রাত পাখির ডাক। এক একটা আওয়াজ হচ্ছে আর সুমনা শিউরে শিউরে উঠছে। দরজায় টোকা পড়ল। সে কাঠ হয়ে গেল। আবার টোকা। দরজার কাছে গিয়ে সুমনা বললো— কে?

— আমি প্রদীপদা সুমনা! একটু খুলবে?

সুমনা আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ফাঁক করলো। প্রবীর ঢুকে এলো। বললো— এইটাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম।

— কী!

— এই, অচেনা জায়গা তো! হঠাৎ, বিশেষত রাতে, দরজা টরজা খুলবে না। আর একটা কথা। তোমার ঠিক নিচের ঘরে সরিৎ আছে, বুঝলে? ধরো দরকার-টরকার পড়লো...সে কেমন একরকম অপ্রতিভ হাসি হাসলো— দেখো, এই যে জানলায় জাল দেখছো। এটা একটা কাঠের ফ্রেমের মধ্যে। ফ্রেমটা খুলে নেওয়া যায় এমনি করে।

সে এগিয়ে গিয়ে জানলার কাঠের ফ্রেমটা খুলে আবার বসিয়ে দিল। বললো— খুব চওড়া কার্নিশ আমাদের বুঝলে?

— কেন? এসব কী বলছেন?

— ভাবছো ঠাকুমার মতো প্রদীপদারও মাথায় ছিট আছে, না? স্নেহের হাসি

হাসল প্রদীপ। সুমনার মাথায় একটা হাত রাখলো— কী জানো সুমনা, সব বাড়িরই নিজস্ব কিছু সেফটি-মেজার থাকে, যেমন বড় বড় হলে, হোটেলে এরোপ্লেনে। এটা থাকা ভালো। ফ্রেম খুলবে। জানলা খোলা, তলায় কার্নিশ। কোনও ব্যাপারই না নিশ্চয়ই কেউ তোমায় দেখিয়ে দেয়নি। আচ্ছা ভাই চলি। গুডনাইট। আমি তোমায় সবসময়ে আশীর্বাদ করবো ভাই, কেমন!

সুমনা কিছু বলবার আগেই প্রদীপ বেরিয়ে গেল। সুমনা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ যেন তার সাড় এলো। তাড়াতাড়ি খাটের তলা, বাথরুম সব আলো জ্বেলে দেখে নিল। তারপর হুড়মুড় করে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

একজন বলে যাচ্ছে দরজা খুলে রেখো না। একজন বলছে জানলা খুলে রেখো। সরিৎদা বললো— গ্রেভ ডেঞ্জার। সরিৎদাকে দেখে যেন তার ধড়ে প্রাণ এল। সে যেন একটা ভৌতিক জগতে বাস করছিল। মানুষের পৃথিবী থেকে একটা মানুষ এইমাত্র এসে পৌঁছেছে। রাজেশ্বরী দেবীকে সবাই উন্মাদ বলছে। সে দেখেছে উনি কেমন অনায়াসে চেহারা বদল করেন। উনি কি সত্যিই ইনভ্যালিড। না সেজে থাকেন? নাঃ আজ আর ঘুম আসবে না।

বললো বটে। কিন্তু কোন একসময়ে সুমনা ঘুমিয়েই পড়েছে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে, লালচে মায়াবি আলো। এক পা এক পা করে মুণ্ডহীন শাকম্ভরীর মূর্তিটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। দুপদাপ করে কারা পালাচ্ছে। তার ঘুম ভেঙে গেল। বুক ঢিপঢিপ করছে। জানলায় তো সত্যিই দুপদাপ আওয়াজ।— সুমনা! সুমনা! জানলা খোলো। শিগগির জানলা খোলো! আমি সরিৎ। জানলা খোলো।

সুমনা দড়াম করে জানলা খুলল। ফ্রেমের ওপারে অস্পষ্টভাবে সরিৎকে দেখা যাচ্ছে। সে কষ্ট করে ফ্রেমটা খুলে ফেলল। কোথা থেকে ধোঁয়া আসছে। চিৎকার উঠছে আগুন! আগুন!

— সুমনা চট করে নেমে এসো। সরিৎ গলায় খুব তাড়া নিয়ে বললো।

আলসেয় নেমে দাঁড়ালে সুমনা। তার বুক ঢিপঢিপ করছে। এই কি সেই বিপদ যার কথা সরিৎ বলেছিল? নিচের তলার জানলার চওড়া সানশেডে লাফিয়ে নামলো সে। তারপর তলায় চওড়া আলসেয়। অতঃপর লাফিয়ে নামতেই জঙ্গল। ছুট ছুট ছুট। —নদীর দিকে ছুটে চলো সুমনা— তার পাশাপাশি ছুটতে ছুটতে বললো— সরিৎ।

আগুন! আগুন! জল! জল! আগুন— চতুর্দিক থেকে তখন চিৎকার উঠছে।

সরিৎ হঠাৎ সুমনাকে ছেড়ে বাড়ির দিকে ছুটে গেল।

— সরিৎদা— আ— সুমনা চেঁচাচ্ছে। সরিৎ চেঁচিয়ে বললো— নদীর দিকে যাও— ভয় নেই, আমি আসছি। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অর্জুন হুইলচেয়ারে করে রাজেশ্বরীকে ঠেলে আনছে। সরিৎকে দেখেই সে ভেতরে ছুটলো। সরিৎ বললো— সুমনা ম্যাডামকে দেখো। সেও লাফ দিয়ে ভেতরে ছুটে গেল। সুমনা চেয়ার ঠেলতে

ঠেলতে নদীর কাছাকাছি এসে থামল। এমন সময়ে সে দেখল দুটো অ্যালসেশিয়ান ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। পেছনে তেজস্বিনীর হাত ধরে সরিৎ। বাড়ির লোকেরা দারোয়ানেরা পাইপে করে জল দিচ্ছে। কাশতে কাশতে রাখীকে কোলে করে টলতে টলতে বেরিয়ে এল অর্জুন। মাটির ওপর শুইয়ে দিল। তার মুখখানা যেন আঁচে ঝলসে গেছে।

সরিৎ ছুটে যাচ্ছে আবার। অর্জুন বললো— আর লাভ নেই সরিৎ— সে হঠাৎ হাহাকার করে উঠলো— দাদাকে বাঁচাতে পারলাম না। ওহ, দাদা-বউদি শেষ হয়ে গেল। বাঁচাতে পারলাম না। ঠাকুমা আই ফেইলড্। এত দিনের চেষ্টা, সব শেষ হয়ে গেল। বুঝতে পারছিলাম এইরকম কিছু একটা হতে যাচ্ছে। দাদা আর পারছিল না। সইতে পারছিল না। কী করলেন ঠাকুমা, এ কী করলেন!

তখন সূর্য উঠছে। প্রচুর নৌকো ভুটভুটি এগিয়ে আসছে। শাকম্ভরীর দ্বীপে আগুন লেগেছে। রানিমার এস্টেটে। দূর-দূরান্ত থেকে প্রজারা ছুটে আসছে।

২০

আজ থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটে সুমনাকে নিয়ে সরিৎ বিশ্বাসের যাবার কথা। কিন্তু সরিৎ এখনও আসছে না। অবশেষে সুমনা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। এবং মোড়ের মাথায় ঘ্যাঁচ করে সরিতের গাড়িটা থামল। সরিৎ দরজা খুলে দিল। সুমনা নীরবে উঠে বসল।

— তুমি তাহলে যাবেই? স্টিয়ারিং-এ হাত সরিৎ তার দিকে আড়চোখে তাকালো।

— হ্যাঁ?

— কেন? ছেড়ে দাও না এসব।

সুমনা সংক্ষেপে বললো— পবিত্র দায়। তুমি বুঝবে না।

দরজা খুলে দিল অর্জুন। তার অশৌচের সাজ। দাড়ি কামানো নেই। চুল বেড়ে গেছে। খালি গায়ে চাদর জড়ানো। কোরা ধুতি। অদ্ভুত দেখাচ্ছে। অদূরে কৌচে বসা তেজস্বিনীরও পরনে নীল পাড় শাদা শাড়ি। চুল হাওয়ায় উড়ছে, মুখ শুকনো। আর রাজেশ্বরীদেবীকে তো চেনাই যাচ্ছে না। কী রকম ভেঙে চুরে গেছেন। খোলা পাকা চুল উড়ছে। প্রসাধন নেই, পারিপাট্য নেই। হঠাৎই যেন রাজেশ্বরী বৃদ্ধা হয়ে গেছেন।

বিষণ্ণ চোখ তুলে বললেন— এসো সুমনা, আমার পাশে বসো। সরিৎ তুমি আমার দুই নাতবউকে বাঁচিয়েছো, আমাকেও। তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো? ভাষা নেই বাবা!

সরিৎ কোনও জবাব দিল না। অর্জুন বসেছিল কার্পেটের ওপর। সে সেইখানে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

রাজেশ্বরী ভাঙা গলায় বললেন— সো! ইয়েট অ্যানাদার অ্যাকসিডেন্ট! অর্জুন তুমিই তাহলে এখন আমার একমাত্র জীবিত নাতি! এসো আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখি।

অর্জুন আস্তে উঠে গিয়ে রাজেশ্বরীর পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর বসল।

— তেজস্বিনী মাই ডিয়ার গার্ল। তুমি আমার নিজের নাতনিরও বাড়া, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমায় মাফ করো বাবা।

তেজস্বিনীর চোখের তলায় কালি। উদ্ভ্রান্ত মুখ। অশৌচের সাজে এই আপাদমস্তক মেমসাহেব মেয়েটিকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। সুমনা নিজেও কালো শাড়ি পরে এসেছিল। তার হঠাৎ মনে হল, এই শাদা এই রুক্ষতা এটাই বোধহয় শোকের আসল চেহারা। এক মুহূর্তে সব ধূসর হয়ে যায়। প্রদীপনারায়ণের জন্য তার একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল। যেন একজন সত্যিকারের প্রিয়জনকে হারিয়েছে। আশীর্বাদ করেছিলেন তাকে।

— কেড়ে নিয়ে গেলে? শেষ পর্যন্ত আমার সবচেয়ে বুঝদার, স্নেহশীল, পুণ্যাত্মা

বড় নাতিটিকেও না নিলে তোমার শান্তি হচ্ছিল না। ওপরের দিকে মুখ করে বললেন— রাজেশ্বরী! শর্মিষ্ঠা, রাখী...সব, সবাই! কী জবাব দেবো আমি ওদের মা বাবাদের। আগুন! শেষ পর্যন্ত আগুন? জল, আগুন, আকাশ, কিছুই কি আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।... সুমনা মাই ব্রেভ গার্ল। জিনি, তোমরা দুজনেই আমার রঞ্জনকে ভালোবেসেছো। কী বলে তোমাদের সান্ত্বনা দেবো জানি না। অর্জুন তুমি শক্ত হও। তুমি এত ভেঙে পড়লে আমি একজন বৃদ্ধা কী করবো? অ্যাকসিডেন্ট! ভাই, ছেলে, বউ, নাতি, নাতবৌ— এ কেমন নিয়তি! কেমন!

সমস্ত কথাগুলোই উনি বলছিলেন থেমে থেমে। অনেকক্ষণ বিরতি দিয়ে দিয়ে। কাঁদছেন না। কিন্তু কান্নার চেয়েও শোকার্ত, ভাঙা গলা।

হঠাৎ সরিৎ একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে খুব কেজো গলায় বললো— অর্জুন! বলো! চুপ করে আছো কেন? ম্যাডাম...প্রদীপদার মৃত্যুটা কিন্তু অ্যাকসিডেন্ট নয়। আত্মহত্যা।

— আ...ত্ম...হ...ত্যা! কীরকম বিহুল হয়ে বললেন বৃদ্ধা। সে কী! কে বললে! অর্জুন ও কী বলছে?

অর্জুন শুকনো চোখে চেয়ে বললো— হ্যাঁ ঠাকুমা, দাদা আর সইতে পারছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম ও কিছু একটা ঘটাবে। আপনি যখন...আমাদের সকলকে ওভাবে অ্যাকিউজ করলেন দাদা আর চুপ করে থাকতে পারেনি। দ্যাট গ্রেট সোল। কতটুকুই বা বড়, তবু দাদাই তো ছিল আমাদের বাবা...মা...আমরা অনাথ চার ভাই, দাদাই আগলে ছিল। চিরকাল!

— কেন? প্রদীপ কেন আত্মহত্যা করবে? কী বলছো অর্জুন খুলে বল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

— বলা খুব শক্ত। অর্জুন বললো— তবু বলবো, বলতেই হবে। দাদার মান রাখতে সত্য আমাকে প্রকাশ করতেই হবে।— অর্জুন মুখ নিচু করে নিজের আঙুলগুলো দেখছে।

— সত্যি কথা বলবে, তো তার জন্যে এত ভূমিকা কেন অর্জুন। বলো!— বলছেন কিন্তু অজানা আশঙ্কায় রাজেশ্বরীর গলা কাঁপছে।

— অনেক মিথ ভেঙে যাবে ঠাকুমা, কিন্তু আপনাকে সইতে হবে।

— কিসের...মিথ? কেন সইতে হবে? কত? কত আর?

— যেটাকে সুইসাইড মনে করছেন, সৌভিকেরটা সেটা হয় অ্যাকসিডেন্ট নয়... খুন... কোনটা জিনি হয়তো বলতে পারবে!— অর্জুন বললো— আর যেটা অ্যাকসিডেন্ট মনে করছেন...দাদারটা সেটা একটা মরিয়া আত্মহত্যা। যেটাকে এতদিন খুন বলে মনে করে আসছেন সেটা একটা আনফর্চুনেট অ্যাকসিডেন্ট— রঞ্জনেরটা। আর প্রত্যেকটারই মূলে আছে রঞ্জন একমাত্র রঞ্জন। ঠাকুমা ভুল বুঝবেন না। তাকে আমি অ্যাডমায়ার করতাম, ভালো তো বাসতামই। কিন্তু আজ আর সত্য গোপন করার

কোনও অর্থ নেই। তিন তিনটে মৃত্যু ঘটে গেছে। ঠাকুমা রঞ্জন ছিল একেবারে দুশ্চরিত্র লম্পট, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর...

— চুপ করো চুপ করো...একটা মৃত মানুষের নামে অপবাদ দিতে তোমার লজ্জা করছে না। সে কি প্রতিবাদ করতে পারবে? ছিঃ।

—- সরিৎ এই সময়ে শান্ত কিন্তু দৃঢ় ও ভরাট গলায় বলে উঠলো— অর্জুন ঠিকই বলেছে ম্যাডাম। রঞ্জন স্বভাবে চরিত্রে যেমন অস্থির, নিষ্ঠুর ছিল তেমনই ছিল যাকে বলে লম্পট। মেয়েদের নিয়ে খেলা ছিল ওর সবচেয়ে প্রিয় নেশা। আমি ওকে ছোটবেলা থেকে দেখছি। জানি।

সে সুমনার দিকে তাকাচ্ছিল না। তাকিয়েছিল রাজেশ্বরীর দিকে। সোজা।

— কী প্রমাণ? প্রমাণ কী এসব কথার?

অর্জুন বললো— প্রমাণ? আপনার মতো অভিজ্ঞ বৃদ্ধাই হোন, আর সুমনার মতো নিষ্পাপ ডাউন-টু-আর্থ মেয়েই হোক সকলকার মাথা ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল রঞ্জনের। ও সেটাই ব্যবহার করতো। এমন কি... বউদি বা রাখীকেও...

— কী কী বললে? বউদি...রাখী...আবার বলো।

— আবার বলার শক্তি আমার নেই। জিনি! জিনি তো জেনেশুনেও মোহ কাটাতে পারেনি। কী নিয়ে তোমাদের ঝগড়া জিনি বলো। চুপ করে আছো কেন? এখনও চুপ করে থাকবে?

তেজস্বিনী প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় বললো— এইজন্যেই। ওর ফ্লার্টিং আর ওর অ্যাফেয়ার আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই রাগারাগি করেছিলাম, এসব চলবে না। তাতেই য়ু গো টু হেল বলে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে চলে গেল।

— ভাবুন। সব জেনেশুনেও যে মেয়েটা ওকে এতটা দিয়েছিল তাকে ও এককথায় নিষ্ঠুর ভাবে রিফিউজ করে চলে গেল। এবং যে-ই আপনি সৌভিকের সঙ্গে জিনির বিয়ে দিলেন, স্রেফ রাগের মাথায় দম্ভে পাগল হয়ে সুমনাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করে নিল। পাছে সরিৎ কিছু বলে দেয় তাই সরিৎকে একেবারে বুঝতে না দিয়ে কাজটা করলো।

সরিৎ আস্তে বললো— বোঝালেও, বললেও কেউ বুঝতো না অর্জুন। রঞ্জন হ্যাড দ্যাট স্ট্রেঞ্জ ডায়াবলিক পাওয়ার ওভার উইমেন।

— আমাদের রঞ্জন সম্পর্কে একটু ডাউট থাকলেও আমি দাদা দুজনেই এতে খুশি হয়েছিলাম সরিৎ, বিশেষত সুমনাকে দেখে। এরকম একটি মেয়ের কাছে ও যদি বাঁধা পড়ে... অর্জুন বললো— কিন্তু তা হবার নয়।— সে মাথা নাড়তে লাগল।

বিহ্বল হয়ে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাচ্ছেন রাজেশ্বরী— জলি। খামখেয়ালি, ঠিকই। বাট চার্মিং হি ওয়াজ ডমিনেটিং লাইক মি মে বি বাট দিস...অল...দিস...

অর্জুন খুব নিচু গলায় বললো— ও কি তাহলে মেজর লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জির মতো ছিল ঠাকুমা? আপনি সেদিন বলছিলেন...

রাজেশ্বরীর মুখের মধ্যে সাড় ফিরে আসে, যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন। বোঝবার চেষ্টা করছেন। বুঝতে শুরু করে ছেন...আলগা আলগা করে বললেন— হি ওয়াজ আ ডেভ্‌ল, স্বয়ং শয়তান...বাইরের লোকে বুঝতে পারত না। কঠিন, প্রচণ্ড টেম্পার, অ্যান্ড অ্যাডইমেন...উইমেন...মোর উইমেন...

সরিৎ বললো— আমি আন্দাজ করেছিলাম ও সৌভিকের ফ্ল্যাটে যাচ্ছে। তেজস্বিনী, আ অ্যাম সরি, ও সৌভিকের অনুপস্থিতিতে তোমার কাছে যেত।

— ইজ দ্যাট ট্রু? রাজেশ্বরী ঝুঁকে পড়ে বললেন— জিনি সে নো। ডু সে নো।

জিনি মুখ ঢেকে ফেলল। বললো— ঠাকুমা আপনি কি জানেন না আমি রঞ্জনকে ফেরাতে পারি না! জানেন না সে আমার কী ছিল!

— তাহলে? অসহায়ের মতো বেরিয়ে এল তাঁর গলা দিয়ে।

সরিৎ বললো— একদিন সৌভিক এসে পড়ে। ন্যাচার্যালি প্রচণ্ড রেগে রঞ্জনকে আক্রমণ করে। ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে ওই খোলা জানালার কাছে চলে যায় ওরা। সৌভিক প্যারাপেট টপকে নিচে পড়ে যায়। রঞ্জন নিজেই আমাকে এ কথা বলেছে। প্রথমে ডিনাই করেছিল। পরে বলেছে।

চারদিক চুপচাপ।

রাজেশ্বরী বললেন— বলো জিনি, ও ইচ্ছে করে সৌভিককে ফেলে দিয়েছিল কিনা! বলো...

জিনি কাঁদতে কাঁদতে বললো— জানি না, আমি সত্যি জানি না...

সরিৎ নিশ্বাস ফেলে বললো— যাই হয়ে থাক ফলাফল একই। ভেবে লাভ কী! কেউই আর বেঁচে নেই।

ঘরময় নিস্তব্ধতা। নিঃশ্বাসের শব্দ আর ঘড়ির শব্দ। সবাই আছে। খালি সুমনা যেন ওখানে থেকেও নেই। তার আপাদমস্তক ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কেউ দেখছে না সে আস্তে আস্তে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

রাজেশ্বরী বললেন— সো, ঠাকুর্দার মতো বদমেজাজি, স্বেচ্ছাচারী লম্পট, তার ওপর খুনী। রঞ্জন? হে ঈশ্বর। এ-ও আমায় শুনতে হল? কিন্তু প্রদীপ? প্রদীপ কেন...অর্জুন বলো। চুপ করে আছো কেন?

— ঠাকুমা জিনি তখন আপনার কাছে সেক্রেটারি। রঞ্জন

গেল।

— আমি তো সুমনাকেও আনতে লিখেছিলাম। প্রতিবার লিখতাম। জি

কিছু কারসাজি কর নি?

তেজস্বিনী জোরে জোরে মাথা নাড়ল।— এবারে করেছিলাম। কিন্তু তখন, নে।

নেভার।

সরিৎ বললো— ও আসলে কখনও চিঠিগুলো সুমনাকে দেখাত না। মুখে বলত— আপনি কী ভয়ানক কুটিল, নিষ্ঠুর, কিছুতেই সুমনাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন না। এবং সুমনাও কোনদিন সে চিঠি জোর করে দেখতে চায়নি। অন্ধের মতো সব বিশ্বাস করে নিয়েছে।

অর্জুন বললো— আইল্যান্ডে ফিরে রঞ্জন জিনির সঙ্গে আগেকার সম্পর্কে ফিরে গেল ঠাকুমা। সবার চোখের সামনে। আপনারও। কেন বুঝতে পারেন নি জানি না।

রাজেশ্বরী বললেন— ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে। পিকনিকে যাচ্ছে, গল্প করছে, বার্ড ওয়াচিং। আমায় ফুল এনে দিত...আমি তো কোনদিন...

— আমরা বুঝতাম। দাদা ওকে সর্বক্ষণ বোঝাতো। রঞ্জন তোমার অত সুন্দর স্ত্রী তোমাকে কত বিশ্বাস করে, তোমার বাচ্চা হয়ে গেছে। যা করেছ করেছ এবার নিজেকে পাল্টাও।— ও কানে নিত না।

অর্জুন তেজস্বিনীর দিকে তাকালো, বললো— জিনি উপায় নেই আমাকে বলতেই হবে।— তেজস্বিনী যেমন বসেছিল বসেই রইল। মুখ নিচু। হাত কোলের ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে।

অর্জুন বললো— রঞ্জন ডিভোর্স পেপার্স তৈরি করে ফেলেছিল। ভালুকটিলায় সেই পেপার্স নিয়ে গোপনে আলোচনা করছিল রাতে। দাদা ওদিকে গিয়েছিল...ওদের ফলো করে... সব শুনতে পেয়ে যায়। রঞ্জন বলছিল— সরিতের সঙ্গে ওকে ঝুলিয়ে দেবো, বুঝলে! এক্কেবারে ক্লিয়ার কেস।

জিনি তারপর বাড়ি ফিরে আসে। রঞ্জন টেলিস্কোপ ফিট করছে তারা দেখবে বলে। এই সময়ে দাদা গিয়ে সোজাসুজি ওকে চ্যালেঞ্জ করে, বলে ডিভোর্স পেপার্সগুলো আমাকে দিয়ে দাও। অনেক অন্যায় অনেক বদমায়েশি করেছো আর করতে দেবো না। শয়তানি পেয়েছো! ও মেয়েটি তোমাকে দেবতার চোখে দেখে। একটা ফুটফুটে মেয়ে তোমার...রঞ্জন বলে তা বেশ তো তুমিই ওর দেবতার স্থান নাও না। তখনই দাদা ওকে একটা চড় মারে। এটা ও এক্সপেক্ট করেনি। দাদা জীবনে কখনও কারো গায়ে হাত তোলেনি। ও ফিরে দাদাকে একটা ধাক্কা দেয়। দাদাও পড়ে যেতে যেতে ওকে একটা ধাক্কা দেয়। ইতিমধ্যে পেপার্সগুলো দাদা নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। ধাক্কা খেয়ে দাদা ভালুকটিলা দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ে যায়। কোনমতে উঠে বাড়ি গিয়ে আমার কাছ থেকে ফার্স্ট এইড নিয়ে শুয়ে পড়ে। আমরা দুজনেই তখন গজরাচ্ছি যে রঞ্জন আসুক। কাল সকালেই ওর সব কীর্তি আমরা ঠাকুমার কাছে ফাঁস করবো। কিন্তু রঞ্জন আর এল না। আসলে ও দাড়িয়েছিল নদীর দিকে পিঠ করে, দাদার সামান্য ধাক্কাতেই বোধহয় ওখানকার ভিজে মাটি ধসে গিয়েছিল। পরের দিন গিয়ে সেই ধসা মাটি আমরা দেখতে পাই। ও জলে পড়ে এবং নিশ্চয় কুমিরটা...

— প্লিজ স্টপ ইট, প্লি-জ...

সুমনা ফিসফিস করে বললো— সে খুব দুর্বলভাবে একটা পা ভাঙা পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালো এবং পরক্ষণেই পড়ে যেতে লাগলো, চোখ বোজা, হাত পা ঠাণ্ডা।

একদিক থেকে অর্জুন আরেকদিক থেকে সরিৎ লাফিয়ে এসে তাকে ধরে ফেললো।

এখন মানুষের জগৎ। এখানে পৃথিবী স্বাভাবিক। কোথাও কোনও ভূত নেই, দুঃস্বপ্ন নেই বাঘ বা মুণ্ডহীন মূর্তির। ফার্ন রোডের ছোট ফ্ল্যাটে নির্ভেজাল বাস্তব। যা দেখা যাচ্ছে তাই-ই সত্য। হিরণ্ময় মিথ্যা দিয়ে কিছু ঢাকা নেই। বিছানায় এলিয়ে শুয়ে আছে সুমনা। দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে সরিৎ। একটু দূরে মিনতির হাত ছাড়িয়ে মায়ের কাছে আসবার জন্যে ছটফট করছে টুকটুক। কী হয়েছে মায়ের? কী হয়েছে? তার চোখে ভয়, কান্না।

খাওয়ানো শেষ করে সরিৎ বললো— এখন একটু ভালো লাগছে তো? আয় টুকটুক এক ছুটে মায়ের কাছে চলে আয় তো! সে মিনতির দিকে চেয়ে বললো— এই কাপটাপগুলো নিয়ে যাও। আর দিদি যেন আজ একেবারে না ওঠে। কিছু করতে দেবে না। খাবার টাবার এখানেই এনে দেবে।

মিনতি চলে যেতে সরিৎ বললো— চুপচাপ শুয়ে থাকো, একটু গান টান শোনো। কালই দেখবে ঠিক হয়ে গেছে। এবার আমি চলি!

কিন্তু যেতে গিয়ে দেখল তার পাঞ্জাবির কোণ সুমনার হাতের মুঠোয়।

— যদি সবই জানতে কোনদিন আমাকে বলোনি কেন? —খুব আস্তে থেমে থেমে শক্তিহীন গলায় সুমনা জিজ্ঞেস করলো।

সরিৎ এখন কী বলবে? সে কি বলবে সে বারবার ইঙ্গিত দিয়েছে বারবার বলবার চেষ্টা করেছে, প্রাণপণ বাধা দিয়েছে যাতে সুমনা শাকম্ভরীর দ্বীপে কিম্বা থিয়েটার রোডের অন্তিম শুনানিতে না যায়। কেননা তাহলেই ভেঙে পড়বে তার স্বপ্ন, তার প্রতিমা, সরিৎ তো ভাঙতে চায়নি! সুমনার এত দুঃখ সে কী করে বরদাস্ত করবে? কিন্তু সুমনা বোঝেনি, শোনেনি, তারও বেশি। ভুল বুঝেছে, অনেক কঠিন কঠিন তিরস্কার সে করেছে সরিৎদাকে। জেলাস, আউটসাইডার, ইনটারফিয়ারিং। স্টিকার দিয়ে সে সব আটকানো আছে সরিতের বুকে।

সরিৎ এসব কিছুই বললো না। একটু হেসে সুমনার হাতে বন্দী তার পাঞ্জাবির প্রান্তটার দিকে তাকিয়ে বললো— কী জানি সুমনা, বোধহয় সে-ও ছিল এক পবিত্র দায়।

(কিশোরবেলায় পড়া এক বিদেশি গল্পের থেকে মূল বিষয়টি অংশত নেওয়া। দুঃখের বিষয় লেখকের নাম, গল্পের নাম মনে নেই।)